স্মরণিকা

মৎস্য পক্ষ ২০০৩

১২-২৬ আগস্ট

সুখ সমৃদ্ধি সচ্ছলতা
মৎস্য চাষের আসল কথা

মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়

স্মরণিকা

মৎস্য পক্ষ-২০০৩

১২-২৬ আগস্ট

সুখ সমৃদ্ধি স্বচ্ছলতা
মৎস্য চাষের আসল কথা

মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ও পশুসম্পদ
মন্ত্রণালয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

২৮ শ্রাবণ ১৪১০
১২ আগস্ট ২০০৩

বাণী

প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস হচ্ছে মৎস এবং এই সম্পদ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। নিঃসন্দেহে মৎস্য হচ্ছে একটি সম্ভাবনাময় উৎপাদনশীল সম্পদ।

সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের সম্মিলিত কর্মপ্রয়াস, সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা, সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনা এবং লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কাংক্ষিত লক্ষ্যমাত্রার উৎপাদন ও অর্থ উপার্জন নিশ্চিত করে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টর বলিষ্ঠ অবদান রাখতে সক্ষম। আমি আশা করি যে, দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে অতিরিক্ত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানীর মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার ক্ষেত্রে এ সেক্টর যথেষ্ট অবদান রাখবে। পরিকল্পিতভাবে আমাদের জলজ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার অফুরন্ত সম্ভাবনা রয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি।

'সুখ, সমৃদ্ধি, স্বচ্ছলতা মৎস্য চাষের আসল কথা' এ বছর মৎস্য পক্ষের এই শ্লোগান তাৎপর্যপূর্ণ এবং সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি। আমি মৎস্য পক্ষ ২০০৩ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৮ শ্রাবণ ১৪১০
১২ আগস্ট ২০০৩

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও দেশব্যাপী মৎস্য পক্ষ উদযাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছরের প্রতিপাদ্য-**"সুখ, সমৃদ্ধি, স্বচ্ছলতা, মৎস্য চাষের আসল কথা"** নির্বাচন সময়োপযোগী ও যথাযথ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

মৎস্য প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস। আত্ম-কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন এবং দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সম্মিলিত কর্মপ্রয়াস, সুসমন্বিত পরিকল্পনা, সমাজভিত্তিক অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনা এবং আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে দেশে মৎস্য উৎপাদন আরো বাড়ানো সম্ভব। অধিক কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রেও মৎস্য সেক্টরের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

সরকার মৎস্য চাষে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। মৎস্য চাষে আমাদের পরিবেশ বান্ধব লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে হবে। সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এলক্ষ্য অর্জনে আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাই।

আমি মৎস্য পক্ষ-২০০৩ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

খালেদা জিয়া

সচিব
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাণী

মাছ আমাদের ঐতিহ্যের অংশ। এক সময় খাল-বিল, নদী-নালার মাছে ছিল বিপুল প্রাচুর্য। তখন মাছ চাষের প্রসংগ ছিল গৌণ। সখের বশে বা ধনী কৃষকের পুকুরের কৌলিন্য বজায় রাখতে ছিল মাছের চাষ। কিন্তু কালের বিবর্তনে একদিকে মাছের চাহিদা বেড়েছে, অপরদিকে জলজ পরিবেশের ব্যাপক বিপর্যয় ঘটেছে। খাল-বিল ভরাট করে জনপদ গড়ে ওঠা, বাঁধ নির্মান, বর্জ্য জনিত পানি দূষণ, কীটনাশকের বিরূপ প্রতিক্রিয়া, অপরিণত মাছ ও ডিমওয়ালা মাছ নিধন ইত্যাদি কারণে মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন একেবারে সীমিত হয়ে পড়েছে।

সংগত কারণেই যুগ প্রবাহের ধারায় এখন আমরা ব্যাপক মাছ চাষের যুগে প্রবেশ করেছি। মাছ চাষ বা উৎপাদন এখন আর সখ বা বিশেষ জনগোষ্ঠীর পেশা কর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মাছ এখন লাভজনক বাণিজ্য পণ্য। মাছ চাষ এখন ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে। ১৯৭৪-৭৫ সালে দেশে মাছের উৎপাদন ছিল ৭.৪০ লক্ষ মেট্রিক টন এখন তা বেড়ে হয়েছে ১৮.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন। ইতোমধ্যেই মৎস্য সেক্টর দেশের আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ ইতিবাচক খাত হিসেবে নিজের অবস্থান তৈরী করে নিয়েছে।

জলমহাল ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন, কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যায় পোনা উৎপাদন, সুষম মৎস্য খাদ্য সরবরাহ জোরদারকরণ, মৎস্য অভয়াশ্রম গড়ে তোলা, নতুন নতুন গবেষণা পরিচালনা, লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার, অপরিণত মাছ ও ডিমওয়ালা মাছ নিধন বন্ধ করা, বেকার যুব জনগোষ্ঠীকে মৎস্য উৎপাদন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান, চিংড়ি উৎপাদন এলাকায় ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি আজকের অগ্রাধিকার কার্যক্রম।

"সুখ, সমৃদ্ধি, স্বচ্ছলতা মৎস্য চাষের আসল কথা"- এবছরের মৎস্য পক্ষের মূল প্রতিপাদ্য। এই তাৎপর্যপূর্ণ আহ্বানকে সংশ্লিষ্ট সকলে মিলে বাস্তবায়নের দৃপ্ত প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। আমি মৎস্য পক্ষ ২০০৩ এর সর্বাংগীন সাফল্য কামনা করছি।

(মুহাম্মদ আবদুল হক)

মৎস্য পক্ষ ২০০৩

সূচীপত্র

ক্রঃ নং	বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা নং
১	বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য খাত এবং উন্নয়ন সম্ভাবনা	মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ	১১
২	বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ ও জলজ পরিবেশ	ডঃ এম এ মজিদ	১৬
৩	অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনার আচরণ বিধি বাস্তবায়ন	মোঃ নজরুল ইসলাম	২০
৪	মৎস্য অবতরণ ও বাজারজাতকরণে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা	এম এ হাই	২৩
৫	মৎস্য গ্রাম প্রশিক্ষণ-গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি রূপরেখা	মোঃ রফিকুল ইসলাম মোঃ আবুল হোসেন (সুমন)	২৬
৬	রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য মান নিয়ন্ত্রণ কার্য্যক্রম	মোঃ মোকাম্মেল হোসেন	৩১
৭	ইলিশ মাছ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন কৌশল	ডঃ জি সি হালদার	৩৪
৮	গলদা চিংড়ির নার্সারী ব্যবস্থাপনা	মুহম্মদ শহীদুল ইসলাম	৪০
৯	বরেন্দ্র অঞ্চলে মৎস্য উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্য্যক্রম	মোঃ আব্দুল খালেক	৪৩
১০	সানুদ্রিক উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্য আহরণ ব্যবস্থাপনা এবং আচরণ বিধি	ডঃ মোঃ গিয়াসউদ্দিন খান	৪৬
১১	মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় বায়োটেকনোলজি	ডঃ এম. জি. হোসেন	৫০
১২	সামুদ্রিক উপরিস্তরের মৎস্য সম্পদের বর্তমান অবস্থা	ড. মমতাজ উদ্দিন	৫৩
১৩	মৎস্য সেক্টরে মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী	অধ্যাপক সাইফুদ্দিন শাহ	৫৭
১৪	মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন গবেষণা কার্যক্রমে মৎস্য বিষয়ক উচ্চ শিক্ষা যুগোপযোগীকরণ	এ কে আতাউর রহমান,	৬০
১৫	মৎস্য সম্পদের সহনশীল উন্নয়নে জলজ পরিবেশ সংরক্ষণ ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব	ডঃ নিলুফা ইসলাম রাগিব উদ্দিন আহমেদ	৬৫
১৬	সমাজ ভিত্তিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা	মাহবুবুর রহমান খান ড. পল থমসন	৬৯
১৭	উপকূলীয় অঞ্চলে পরিবেশ সহনীয় চিংড়ি চাষ	মোঃ রেজাউল করিম	৭৪
১৮	বাগদা চিংড়ির নার্সারী ব্যবস্থাপনা	হাবিবুর রহমান খন্দকার	৭৭
১৯	মাছ চাষে উদ্ভুত সমস্যা সমাধানের উপায়	মোঃ মনিরুজ্জামান	৮১
২০	প্লাবণ ভূমিতে সামাজিক মৎস্যচাষ বাস্তবায়ন কৌশল	হাসান ইমাম শাওন	৮৪
২১	ছড়া জাতীয় জলাশয়ে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা কৌশল	স্বপন কুমার দেব	৮৮
২২	বাংলাদেশের মৎস্য প্রজাতির অবস্থা	নাসিরউদ্দিন মোঃ হুমায়ুন	৯১
২৩	চলনবিলে মৎস্য সম্পদ হ্রাস-প্রাপ্তির কারণ পর্যালোচনা	মোঃ সিরাজুল করিম	৯৫
২৪	আত্ম কর্মসংস্থান ও দারিদ্রবিমোচনে ময়মনসিংহ মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্পের অবদান	মোঃ আব্দুল খালেক মোঃ আলী রেজা	৯৯

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য খাত এবং উন্নয়ন সম্ভাবনা

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

মৎস সম্পদের বিভিন্ন উৎসের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে অধিক সংখ্যক জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করা সহ এর ভবিষ্যত গ্রহণ করার মাধ্যমে দেশের দারিদ্র বিমোচনসহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করাই বর্তমানে মৎস্য খাতের প্রধান লক্ষ্য। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মৎস্য উপ-খাতটি আবহমানকাল হতেই গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্ধিত জনগোষ্ঠির প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, গ্রামীন জনগোষ্ঠির বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, পরিবেশের উন্নয়নসহ মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য খাতের অবদান অনস্বীকার্য। রপ্তানী বাণিজ্যের প্রায় ৫% মৎস্য খাতের অবদান। বর্তমানে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানী পণ্য তালিকায় ২য় অবস্থানে রয়েছে। এ দেশের মানুষের ৬৩% প্রাণীজ আমিষের যোগান দিচ্ছে মাছ। দেশের প্রায় ১.২ কোটি জনগোষ্ঠি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবিকা নির্বাহে মৎস্য খাতের উপর নির্ভরশীল। তন্মধ্যে প্রায় ১২ লক্ষ সার্বক্ষণিক ভাবে এবং ১.০৮ কোটি পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে। মৎস্য সেক্টরে বর্তমানে বার্ষিক শতকরা ৩.৫ হারে শ্রম শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জন্য আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দারিদ্র বিমোচনে মৎস্য খাতটিকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনা করা যায়। মৎস্য সম্পদের বিভিন্ন উৎসের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে অধিক সংখ্যক জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করা সহ এর ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করে দেশের দারিদ্র বিমোচনসহ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

মৎস্য উৎপাদনের ক্রমধারা ঃ

ষাট ও সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ৮০% এর অধিক আহরিত হতো মুক্ত জলাশয় হতে। ১৯৯০-৯১ সালে মাছের মোট উৎপাদন ছিল প্রায় ৮.৯৬ লক্ষ মেট্রিক টন এবং জনসংখ্যার নিরিখে তখন মাথা পিছু দৈনিক প্রাণীজ আমিষ গ্রহণের পরিমাণ ছিল প্রায় ২১ গ্রাম যা চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত কম। এদেশের মানুষের জন্য প্রাণীজ আমিষের যোগান বৃদ্ধিতে সরকারী উদ্যোগে মৎস্য সংক্রান্ত কার্যক্রম জোরদার করা হয়। আশি পরবর্তী সময় হতে পরিবেশগত বিবর্তন এবং মনুষ্য সৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রাকৃতিক মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি। তবে বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য চাষ কার্যক্রমের প্রসার ঘটতে থাকে। এছাড়া, মুক্ত জলাশয় হতে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে সরকারি উদ্যোগে জনগণের সরাসরি সম্পৃক্ততায় পোনা মজুদ করণের মাধ্যমে মাছ উৎপাদনের কর্মসূচী পরিচালিত হয়-যা বর্তমানেও অব্যাহত আছে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক তাদের নিয়মিত সম্প্রসারণ ও উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি উদ্যোগে মৎস্য উৎপাদন কার্যক্রমটি একটি সামাজিক আন্দোলন ও মর্যাদায় পরিণত হয়। সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে এর উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১-২০০২ ইং সালে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৮.৯০ লক্ষ মেট্রিক টনে পৌছে। রপ্তানী এবং আহরনোত্তর অপচয় বাদ দিয়ে বর্তমানে দৈনিক মাথাপিছু মাছ গ্রহণের পরিমাণ প্রায় ৩৩.৯৬ গ্রামে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় যদিও এ পরিমাণ অত্যন্ত কম তথাপি আমাদের প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬৩% যোগান এখনও মাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৯১-৯২ সাল থেকে অদ্যাবধি মাছের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ৬-৮% এর মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। এ ছাড়া, মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) মৎস্য খাতটি গুরূত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। ১৯৯৯-২০০০ সালের চলতি মূল্যে জিডিপিতে এর অবদান ৫.২৪% (২০০১-২০০২) যা কৃষি সেক্টরের মোট উৎপাদনের প্রায় শতকরা ২০ ভাগ।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হলো মৎস্যচাষী ও মৎস্যজীবিদের স্থিতিশীল সুবিধা নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে মৎস্য সম্প্রদায়ের উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন, বেসরকারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহ ও সেবা প্রদান, সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাধন, বেকার যুব সম্প্রদায়ের আয়ের সুযোগ সৃষ্টি এবং দেশের জনগণের পুষ্টির যোগান দান। দেশের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমাপ্তি বৎসরে (২০০১-২০০২) বার্ষিক মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা ২০.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন নির্ধারণ করা হয়েছিল। উক্ত পরিকল্পনা মেয়াদের শেষ বছরে উৎপাদন হয়েছে ১৮.৯০ মেঃ টন। এর ফলে দৈনিক

সালের মধ্যে উপকূলীয় জেলা সমূহের চিংড়ি চাষ এলাকায় ২১ টি চিংড়ি অবতরণ কেন্দ্র ও সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি হস্তান্তর, রোগবালাই নিয়ন্ত্রণ, হ্যাচারী হতে পোনা সরবরাহ নিশ্চিতকরণসহ চিংড়ির সম্ভাবনা ও এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ৩ টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। গলদা চিংড়ি চাষকে জনপ্রিয় এবং সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সারা দেশের ২০টি সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে গলদা হ্যাচারী এবং নার্সারী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গলদার সাথে কার্পের মিশ্রচাষ ব্যবস্থাপনা কৌশল সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প প্রণয়ন করা হচ্ছে।

গ) মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ঃ

পরিবেশগত বিবর্তন এবং মনুষ্য সৃষ্ট নানাহ প্রতিবন্ধকতার কারণে মুক্ত জলাশয় হতে বিগত বছরগুলোতে মাছের গড় প্রবৃদ্ধি ক্রম হ্রাসমান। অথচ ষাট বা সত্তর দশকের প্রথম ভাগে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের ৮০% এর অধিক যোগান আসত উন্মুক্ত জলাশয় হতে। বাংলাদেশে নদী ও মোহনাঞ্চল, সুন্দরবন, বিল, হাওড়, কাপ্তাই হ্রদ ও প্লাবনভূমি সহ প্রায় ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর মুক্ত জলাশয় রয়েছে। ২০০১-২০০২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মাছ উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি। মুক্ত জলাশয়ের বর্তমান প্রতিবন্ধকতা সমূহ দূর করণের মাধ্যমে এ বিশাল সম্পদকে সঠিক ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা গেলে এর প্রবৃদ্ধি বহুলাংশে বাড়ানো সম্ভব হবে। মুক্ত জলাশয় হতে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে মৎস্য আইন ও বিধিসমূহের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ, মুক্ত জলাশয়ে লক্ষ্য জনগোষ্ঠির অংশীদারিত্বে সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় সম্পদ সংরক্ষণ, সরকারী উদ্যোগে নির্দিষ্ট জলাশয়সমূহে পর্যাপ্ত সংখ্যক পোনা অবমুক্তি; নদী, বিল বা প্লাবনভূমির নির্দিষ্ট স্থানে মৎস্য অভয়াশ্রম সৃষ্টি, মৎস্য আবাস পুণরুদ্ধারসহ মৎস্যজীবীদের ব্যাপক সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে এর ব্যবস্থাপনাগত উৎকর্ষতা সাধন করে কাঙ্খিত উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। ২০০২-২০০৩ সালে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনকল্পে পূর্বের ধারাবাহিকতায় ৭ টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল যা এখনও অব্যাহত আছে। এ সমস্ত প্রকল্পের আওতায় মৎস্যজীবীদের সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, সমাজ ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার অধীনে নির্দিষ্ট জলাশয়ে পোনা অবমুক্তি, মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ, অভয়াশ্রম সৃষ্টি, ঋণ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

আমাদের দেশের মৌসুমী প্লাবন ভূমির পরিমাণ ২৮.৩৩ লক্ষ হেক্টর। এই সমস্ত মৌসুমী জলাশয়গুলিতে মূলত ধান চাষ করা হয়। ধান ক্ষেতে সার প্রয়োগের ফলে বর্ষার শুরুতেই এই সব পানিতেই জু প্লাংকটন ও ফাইটোপ্লাংকটন অধিক পরিমাণে জন্মায় এবং এই গুলি মাছের উত্তম খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। এই জলাশয়গুলি অনেক ক্ষেত্রে কোন কোন স্থানে বাঁধ কিংবা স্লুইস গেট নির্মাণ করে পানি সংরক্ষণ করে পাঁচ থেকে ছয় মাস মাছ চাষ করা খুবই সম্ভব। কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার পানকৌড়ী প্রকল্পটি এ ক্ষেত্রে একটি প্রতিকৃতির ভূমিকা পালন করছে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ, বগুড়া, যশোর, খুলনা অঞ্চলের এ কার্যক্রম বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এই কার্যক্রমটি সারা দেশে প্রসার করা গেলে মৎস্য উৎপাদনে যুগান্তকারী বিপ্লব সাধন করা সম্ভব হবে। মৎস্য অধিদপ্তর বর্তমানে কাজটি অগ্রাধিকার কার্যক্রম হিসেবে হাতে নিয়েছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে বিভিন্ন আকার ও বৈশিষ্ট্যের প্রায় ১০,০০০ হাজার জলমহাল আছে, যেগুলো ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে থেকে রাজস্ব ভিত্তিক বাবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। এ সমস্ত জলমহালের ব্যবস্থাপনা মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করণের মাধ্যমে জৈবিক ও উৎপাদনশীল ব্যবস্থাপনার আওতায় পরিচালনার বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত না হওয়ায় মুক্ত জলাশয়ের উৎপাদন কৌশল নির্ধারণে বিঘ্ন ঘটছে। এসমস্ত জলাশয়ে দরিদ্র মৎস্যজীবী, দুস্থ মহিলা, জলাশয় পার্শ্বস্থ বেকার যুবক, প্রান্তিক ও ভূমিহীন চাষীদের সম্পৃক্ত করা গেলে এ বিশাল সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনসহ উৎপাদনে ধনাত্মক প্রভাব ফেলতে সচেষ্ট হবে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১৬৫ টি জলমহাল মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভায় জলমহালসমূহ মৎস্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে হস্তান্তর পূর্বক ব্যবস্থাপনার জন্য নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। জলমহালসমূহ হতে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে মৎস্যজীবীদের ব্যাপক সম্পৃক্ততায় এগুলোকে জৈবিক উৎপাদনশীল ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট ন্যস্ত করা আবশ্যক।

দেশের মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে বর্তমান সরকার বিগত বছরে (২০০২-০৩) সরকারী রাজস্ব খাত হতে ২.৫ কোটি টাকাসহ চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের উপযুক্ত মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্ত করা হয়েছে। চলতি আর্থিক সালেও সরকারী রাজস্ব খাত হতে সারাদেশের ৬৪টি জেলার সবকটি উপজেলার উপযুক্ত জলাশয়ে প্রায় ৩.০০ কোটি টাকার পোনা অবমুক্তির কর্মসূচি রয়েছে। বর্ষাপ্লাবিত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি,

বাড়ানোর জন্য সমন্বিত উদ্যোগের পাশাপাশি এ খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। চিংড়ি ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য খাদ্য উপাদান ও খাদ্য আমদানি, উৎপাদন ও তা প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

মধ্যমেয়াদী ত্রিবার্ষিক পরিকল্পনায় মৎস্য সেক্টরের কার্যক্রমের রূপরেখা

বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন মধ্যমেয়াদী ত্রিবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের শেষ বছরের (২০০৫-০৬) মোট মৎস্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ২৪.৪৫ লক্ষ মেঃ টন নির্ধারণ করা হয়েছে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের শেষ বছরে (২০০১-০২) দেশে মোট ১৮.৭০ লক্ষ মেঃ টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে। বিগত দশকে মাছের গড় প্রবৃদ্ধি ৬-৮% এর মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। বর্তমানে মাথাপিছু গড় মৎস্য প্রাপ্তির ধারা বজায় রাখতে বর্তমান ত্রিবার্ষিক মেয়াদ শেষে মৎস্য উৎপাদন অন্ততঃ ২২.০০ লক্ষ মেঃ টনে উন্নতি করতে হবে। উক্ত পরিকল্পনা মেয়াদে মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নে সরকারি বিনিয়োগ ২০০২-০৩ আর্থিক সালের ১২৫ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২০০৫-০৬ আর্থিক সালে ১৮০ কোটি টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে।

মধ্যমেয়াদী ত্রিবার্ষিক পরিকল্পনায় মৎস্য খাতের উন্নয়নে যেসকল কৌশল ও কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়েছে তার মধ্যে দারিদ্র বিমোচন প্রক্রিয়ায় মৎস্য সম্পদ উন্নয়নকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গুরুত্ব প্রদান; দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে মৎস্য সেক্টরে কর্মসূচি ভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন; মৎস্য সেক্টরের উন্নয়ন সম্ভাবনাকে গতিশীল করণের লক্ষ্যে সকল পর্যায়ের সুফলভোগীদের বিশেষ করে দরিদ্র মৎস্যজীবিদের অংশ গ্রহণের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান; জাতীয় মৎস্যনীতি'৯৮ এবং মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক অন্যান্য আইন, বিধি ও অধ্যাদেশ সমূহ পর্যালোচনা পূর্বক তা দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক করা; দরিদ্র মৎস্যজীবিদের চাহিদা পূরণে প্রাতিষ্ঠানিক সেবা বৃদ্ধি করা; অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের উৎপাদন স্থায়ীত্বশীল করণের লক্ষ্যে মৎস্য আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করা; মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে পোনা মাছ অবমুক্তকরণের কর্মসূচি বাস্তবায়ন; মুক্ত জলাশয়ে দরিদ্র মৎস্যজীবিদের অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা; দেশের সকল বদ্ধ জলাশয়ে বিশেষ করে পুকুর-দীঘিতে নিবিড় মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ; উপকূলীয় অঞ্চলে স্থায়ীত্বশীল এবং পরিবেশ সহায়ক চিংড়ি ও মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ; সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে দক্ষ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন অধ্যাদেশ বিধি, ইত্যাদি সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করা; মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করত দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ; মৎস্য চাষ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এবং ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রাপ্তির মাধ্যমে সম্প্রসারণ সেবা বৃদ্ধি; রপ্তানীযোগ্য মৎস্য পণ্যের গুণগতমান আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে অক্ষুন্ন রাখার জন্য উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন এর প্রতিটি ধাপে হ্যাচাপ পদ্ধতির অনুসরণ।

উপসংহার

মৎস্য সম্পদের উজ্জল সম্ভাবনা ও উন্নয়ন নিরীক্ষে বর্তমান সরকার মৎস্য খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে এর উন্নয়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা গ্রামীণ পরিসরে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, বর্ধিত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাণীজ আমিষের সরবরাহ বৃদ্ধি, পরিবেশের উন্নয়ন সহ দরিদ্র মৎস্যজীবিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য এ সেক্টরে সরকারী বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। চাষী পর্যায়ে কাঙ্খিত ফলাফল পেতে হলে প্রয়োজন লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও তার ব্যাপক সম্প্রসারণ। প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন নতুন নতুন প্রযুক্তির প্যাকেজ উদ্ভাবন করে তা চাষীর দোরগোড়ায় নিয়ে যেতে হবে। গবেষণা ও সম্প্রসারণ সেবার মান বৃদ্ধির পাশাপাশি এ দুটোর কার্যক্রম আরও নিবিড় ও কার্যকরী করে তুলতে হবে। মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা এবং মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও "সুখ সমৃদ্ধি সচ্ছলতা মৎস্য চাষের আসল কথা" এ প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে দেশব্যাপী মৎস্যপক্ষ'০৩ উদযাপন হতে যাচ্ছে। দেশের এ সম্ভাবনাময় খাতে সুসম উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসহ সকল পর্যায়ের সার্বিক অংশ গ্রহণের মাধ্যমে মাছ চাষকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়া প্রয়োজন। দেশিয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সকলের সম্পৃক্তি ও সমন্বিত প্রয়াসই আমাদের অঙ্গীকার।

পরিবেশ দূষণ (৫) জলবায়ুর পরিবর্তন ইত্যাদির কারণে প্রাকৃতিক জীব-বৈচিত্র ও তার গতিশীলতা বিনষ্ট হয়ে থাকে। এ সকল অবস্থাসমূহ পরিবেশের বিবর্তনও তরান্বিত করে যা একটি নির্দিষ্ট জলাশয়ের বিদ্যমান মৎস্য জনগোষ্ঠির গঠন ও তার সার্বিক জীবন ধারণ প্রক্রিয়ায় বিরুপ প্রভাব ফেলে। ফলে পরিবর্তিত পরিবেশে ইতোমধ্যে বিপন্ন প্রজাতি নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে বিলুপ্তির দিকে ধাবিত হয়।

আমরা আসলে বুঝতেও পারি না যে, **জলজ পরিবেশ** কতটা ভয়ঙ্কর ও নাজুক। একেবারেই মানুষের যথেচ্ছা ব্যবহারের কারণে জলজ পরিবেশ ক্রমাগত বিনষ্ট হয়ে অনেক ক্ষেত্রে স্থায়ী ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। উন্নয়ন কর্মকান্ডের পাশাপাশি প্রাকৃতিক অমোঘ প্রক্রিয়ায় মৎস্য উৎপাদনের উৎস হিসাবে পরিচিত হাওড়-বাওড়, খাল-বিল, নদী-নালা ইত্যাদি ক্রমশ সংকোচন ও পলি জমে জমে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ফলে এই সকল জলাশয় মাছের আবাসস্থল হিসাবে অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে। এভাবে মূল জলাশয়গুলি রূপান্তরিত হতে হতে এক সময় তা পুরোপুরি বিলীনও হয়ে যাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার ও চিংড়ি চাষের কারণে উপকূলীয় প্যারাবন ও পরিবেশ আজ হুমকির সম্মুখীন। যথাযথ সংস্কারের মাধ্যমে এর পুনরুদ্ধার আবশ্যক। জলাশয়ের সংকোচন রোধ, সংস্কার ও সংরক্ষণ কাজ আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে অবশ্যই সরকারি ব্যায়ে করতে হবে।

একদিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাব অন্যদিকে মুক্ত জলাশয়ে সকলের মৎস্য আহরণের চিরাচরিত অবাধ অধিকার মৎস্য আহরণকারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়ে তুলছে। অতএব, অতি আহরণের ফলেও মাছের প্রাপ্যতা হ্রাস পাচ্ছে।

বিদেশী মাছের আমদানী ঃ

আজকালকার মৎস্যচাষীরা নিঃসন্দেহে খুবই উদ্যোগী। ফলে তারা অধিক উৎপাদন ও লাভের আশায় উন্নত জাতের মৎস্য প্রজাতি আমদানী করতে ব্যস্ত। উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে দ্রুত বর্ধনশীল মাছ আমদানী করা যেতে পারে। তবে আমদানীকৃত মাছের বিস্তারে দেশী মাছের ক্ষতি হোক ইহা অবশ্যই কাম্য নয়। এ জন্য মৎস্য আমদানীর নীতিমালা ও আমদানীকৃত মাছের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর তবেই কোন নির্দিষ্ট বিদেশী প্রজাতির মাছ আমদানীর অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে।

এ যাবত বাংলাদেশে ১৩ টিরও বেশি বিদেশী প্রজাতির মাছ কোন না কোন ভাবে বাংলাদেশে এসেছে। এগুলোর মধ্যে থাই পাঙ্গাস, আফ্রিকান মাগুর, থাই সরপুটি,কমন কার্প, গ্রাস কার্প, সিলভার কার্প, ব্ল্যাক কার্প, বিগ হেড কার্প, তেলাপিয়া অন্যতম। এর বেশ কয়েকটি মাছের খাদ্যাভ্যাস এবং আবাসস্থল খামার পরিবেশে আমাদের দেশীয় প্রজাতি কয়েকটি মাছের অনুরূপ হওয়ায় খাদ্য ও আবাসস্থলের প্রতিযোগিতার কারণে কতিপয় দেশীয় প্রজাতির মাছ আজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। আবার দেশীয় পরিবেশে স্থিতিশীলতা লাভ করতে পারে নাই। মৎস্য আমদানীর সবচেয়ে বড় ঝুকি হল আমদানীকৃত কোন মাছ এমন কোন রোগ বয়ে আনতে পারে যে রোগের প্রতি দেশীয় মাছের প্রতিরোধ ক্ষমতা সীমিত। এমনটি হলে প্রাকৃতিক মৎস্যভান্ডারে ব্যাপক মড়ক দেখা দিতে পারে। ইতোমধ্যে মিল্ক ফিশ ও জাপানিজ চিংড়ি (পিনিয়াস জেপোনিকাস) দেশে আনা হয়েছে। মৎস্যখামার এবং প্রাকৃতিক জলজ পরিবেশের মধ্যে পরিবেশগত কারণে নিবিড় যোগাযোগ বিদ্যমান থাকায় আমদানীকৃত মাছ প্রাকৃতিক জলাশয়ে ছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে আবাসস্থলের প্রতিযোগিতাসহ দেশীয় মাছের প্রভূত ক্ষতিসাধনের মত চরম বিপদ ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। কাজেই পরিবেশ এবং রোগ বিস্তার উভয় কারণেই বিদেশী মাছের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। আমদানীকৃত মাছ স্বাস্থ্যগতভাবে সবল এবং রোগমুক্ত কিনা তা পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়ার জন্য কোয়ারেন্টাইন ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা বাঞ্ছনীয়। ইতোমধ্যে বিভিন্ন দেশে এই পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

বিপন্ন প্রজাতির কয়েকটি দেশীয় মাছ ঃ

পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্রের বিপর্যয়ের প্রকৃত অবস্থা ও বিবর্তনের ধারা অনুধাবন করা অত্যন্ত জটিল বিষয়। কারণ বাংলাদেশে অনেক পানি উন্নয়ন তথা বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে, মৎস্য জীব-বৈচিত্রে যার প্রভাব আদৌও নিরুপণ করা হয়নি। কিন্তু এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া যে পড়েছে বিল-বিলান্তিতে মাছের অভাব থেকে তা বুঝতে কারও অসুবিধা হয় না। প্রায় ৩০/৩৫টি দেশীয় প্রজাতির মাছ আজ বিপন্ন অথবা বিপদগ্রস্ত অবস্থায় আছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। এর মধ্যে রয়েছে মহাশোল, নান্দিনা, গণিয়া, সরপুঁটি, শোল, গজার, বাইম, গুতুম, চিতল,ফলি,বাঙ্গনা, খলিশা, চান্দা, নাপিত, চেওয়া এবং রানি। পরিবেশের বিবর্তন ও রোগের বিস্তার, দেশীয় মাছের সাথে আমদানীকৃত মাছের খাদ্য প্রতিযোগিতা উল্লেখিত মাছগুলির বিপর্যয়ের কারণ বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। জলাশয়গুলি পুরো মাত্রায় পানি সেচে শুকিয়ে ফেলায় প্লাবনভূমিতে এ সকল মাছের বংশ ক্রমান্বয়ে বিলীন হতে চলেছে। বিপন্ন এ সকল মাছ সংরক্ষণকল্পে কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবনের মাধ্যমে উৎপাদিত পোনা

খাদ্য উৎপাদনের শতকরা ৭.৫ ভাগ মৎস্য সম্পদের অবদান ও তা একশত কোটি লোকের আমিষের প্রধান উৎস। তা সত্ত্বেও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের প্রায় ৮০ কোটি মানুষের মৌলিক পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের সংস্থান নেই। বর্তমান বিশ্বে খাদ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি পেলেও তা স্বল্প আয়ের দরিদ্র মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরেই রয়ে গেছে। অতএব, বিশ্ব জুড়ে দরিদ্রতার অবসান ঘটাতে না পারলে ক্ষুধা এবং খাদ্য সমস্যা শুধু যে রয়েই যাবে তাই নয়, ভবিষ্যতে এর প্রকোপ আরোও বৃদ্ধি পাবে। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৯৬ সনের নভেম্বরে রোমে অনুষ্ঠিত বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা সম্মেলনে দারিদ্রতাকে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার প্রধান কারণ হিসাবে আখ্যায়িত করে দারিদ্র বিমোচনের জন্য বিশ্বব্যাপী অনুকূল রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি ও নিশ্চিত করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করা হয়েছে। বিশ্বের সকল মানুষের জন্য সকল সময়ে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয় বৃদ্ধিকল্পে মৎস্যসহ সকল কৃষিজাত খাদ্য উন্নয়নের জন্য অংশিদারিত্বমূলক পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্ত বায়নের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে।

জনসংখ্যা ও মাথাপিছু মাছ গ্রহণের হার বৃদ্ধি এবং বিশ্ব জুড়ে মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আহরণের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার প্রেক্ষাপটে খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তুলতে মৎস্যচাষ ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ভবিষ্যতে চাহিদা অনুযায়ী মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে পর্যায়ক্রমে নিবিড় মৎস্যচাষ, উন্নত ব্যবস্থাপনা, দ্রুত বর্ধনশীল এবং রোগ-বালাই প্রতিরোধ শক্তি সম্পন্ন মৎস্য প্রজাতি উদ্ভাবন করতে হবে। নির্বাচিত প্রজনন পদ্ধতিতে অধিক উৎপাদনশীল ও রোগ-বালাই প্রতিরোধ শক্তি সম্পন্ন মৎস্য প্রজাতি উদ্ভাবন সম্ভব। এসব বিষয়ে সফলতার জন্য গবেষণা জোরদার করতে হবে। কিন্তু নির্বাচিত প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হবে এক ব্যাপক জীব-বৈচিত্র সম্ভারের অবস্থান। এ কারণে মৎস্য ক্ষেত্রে জীব-বৈচিত্রের যথাযথ সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্রমাবনতি জলজ জীব-বৈচিত্র রক্ষার ক্ষেত্রে এক মারাত্মক হুমকী হয়ে দেখা দিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে জীব বৈচিত্র নষ্ট করতে পারে এমন সকল কার্যক্রম অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। জলজ পরিবেশের পুনরুদ্ধার, উন্নয়ন ও সুষ্ঠ সংরক্ষণের জন্য গড়ে তুলতে হবে আন্তর্জাতিক তহবিল।

বর্ধনশীল মাছের পোনা মজুদকরণ কর্মসূচি গ্রহণ এবং প্লাবনভূমি ও ধানক্ষেতে মাছ চাষ প্রযুক্তি প্রয়োগ;

(গ) দেশের জলমহালসমূহে পর্যায়ক্রমে রাজস্ব ভিত্তিক স্বল্প মেয়াদী ইজারা পদ্ধতির ব্যবস্থাপনা হতে বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদন ভিত্তিক জৈব ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রবর্তন;

(ঘ) মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র রক্ষায় মুক্ত জলাশয়ে বিশেষ উপযোগী স্থানে অভয়াশ্রম স্থাপন করা এবং মাছ ও চিংড়ির প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র সংরক্ষণ করা;

(ঙ) অপরিকল্পিতভাবে শিল্প ও নগরের বর্জ্য নিষ্কাশনের কারণে মুক্ত জলাশয়ের পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, সড়ক ও রাস্তাঘাট নির্মাণ, শিল্পকারখানা নির্মাণ ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণপূর্ব মৎস্যসম্পদের ওপর তার প্রভাব নিরূপণ করে সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) জীববৈচিত্র সংরক্ষণের নিমিত্তে প্রাকৃতিক উৎস হতে মাছ ও চিংড়ি পোনা আহরণ সীমিতকরণ বা সম্পূর্ণ বন্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহন।

(জ) মৎস্য সম্পদের জন্য অতিমাত্রায় ক্ষতিকারক কারেন্ট জালের আমদানী, প্রস্তুত, বিতরণ, বাজারজাতকরণ, মজুদ ও ব্যবহার নিষিদ্ধকরণকল্পে এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক জালের ব্যবহার সীমিতকরণকল্পে মৎস্য সংরক্ষণ আইন ও বিধান যুগোপযোগী করে সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ।

৪। দায়িত্বশীল মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা ঃ

৪.১ রাজস্ব ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা : মুক্ত জলাশয়ের মধ্যে বিল, বাওড়, মরা নদী, হাওড় ও প্রবাহমান নদ-নদী মিলিয়ে প্রায় ১০,০০০ রেকর্ডেড জলমহালের ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণকারী ভূমি মন্ত্রণালয় এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রশাসনের মাধ্যমে রাজস্ব ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার জন্য ইজারা বন্দোবস্ত ব্যবস্থা চালু আছে। মৎস্য উৎপাদন ও আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং এগুলোর পরিবেশগত অবস্থা সংরক্ষণের জন্য কোন প্রকার বিজ্ঞানসম্মত জৈবিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম না থাকায় নির্বিচারে অতিমাত্রায় মৎস্য আহরণের ফলে ক্রমশ জলমহালগুলোর উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে। রাজস্ব ভিত্তিক ইজারা ব্যবস্থার সুযোগে সৃষ্ট মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাবে মৎস্যজীবিদের অধিকার ক্ষুন্ন করা হয়। জলমহাল গতানুগতিক রাজস্ব ভিত্তিক স্বল্প মেয়াদে ইজারা পদ্ধতিতে গৃহীত অধিক মুনাফার জন্য অতিমাত্রায় মৎস্য আহরণ এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক জৈবিক ব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতি উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন প্রবৃদ্ধি না হওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত।

৪.২ নতুন জলমহাল নীতিমালা : 'জাল যার জলা তার' নীতির উপর ভিত্তি করে মৎস্যজীবিদের জীবিকা নির্বাহের লক্ষ্যে মৎস্যজীবিদের জলমহাল অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ১৯৮৮ সনে নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করে পরীক্ষামূলক পাইলট আকারে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালার উদ্দেশ্য ছিল :

(ক) জলমহাল ব্যবস্থাপনায় ইজারা পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে প্রকৃত মৎস্যজীবিদের মৎস্য আহরণের অধিকার প্রদান;

(খ) মধ্যস্বত্বভোগী ইজারাদার বা মহাজনের কবল থেকে মৎস্যজীবিদের মুক্ত করে মৎস্য উৎপাদন ও সংরক্ষণের জন্য জৈবিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;

(গ) সহনশীল মাত্রায় মৎস্য আহরণের ভিত্তিতে প্রকৃত মৎস্যজীবিদের অধিকারপত্র প্রদান করে নির্ধারিত ফি এর মাধ্যমে রাজস্ব আয় নিশ্চিত করা।

এসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ৩০০ টি জলমহাল মৎস্য অধিদপ্তরে ন্যস্ত করে জলমহাল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালু করা হয়। এই নীতিমালার আলোকে চিহ্নিত জলমহালের তীববর্তী ও পার্শ্ববর্তী প্রকৃত পেশাদার মৎস্যজীবিদের তালিকা প্রণয়ন করে তা উপজেলা ও জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদন করে ব্যবহৃত জাল ও মাছ ধরার উপকরণের প্রকার, ধরন ও পরিধি বিবেচনা করে অধিকারপত্র প্রদান ও ফি নির্ধারণ করা হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও স্থানীয় প্রশাসন নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা হয়। জৈবিক ব্যবস্থাপনার পাইলট কমসূচিতে জলমহালে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের জনশক্তির স্বল্পতা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর দুর্বলতা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে পরীক্ষামূলকভাবে উল্লেখিত ৩০০ জলমহাল নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। তাই সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে মত বিনিময় করে জলমহাল নীতিমালা বাস্তবায়নে সমস্যাদি চিহ্নিত করে তা সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে আরো সময়োপযোগী, অধিক কার্যকর ও চাহিদামাফিক করে তোলা হয়েছে।

৪.৩ সমাজ ভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনা : অতীতের জলমহাল ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতার আলোকে উৎপাদন ভিত্তিক জৈবিক ব্যবস্থাপনা, সমাজ ভিত্তিক অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনা ও অভয়াশ্রম স্থাপনের মাধ্যমে মাছের বংশ বিস্তার ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তর, স্থানীয় এনজিও এবং ইজারা গ্রহীতা সুফলভোগী গোষ্ঠিসহ সকল স্ট্যাক হোল্ডারদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে জলমহালের জৈবিক ব্যবস্থাপনা ও ইজারামূল্য আদায়

মৎস্য অবতরণ ও বাজারজাতকরণে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

এম এ হাই
পরিচালক (ক্রয় ও বিপণন), বিএফডিসি

দেশের সামগ্রিক আর্থ সামাজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে মৎস্য সম্পদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে অব্যাহতভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রাণীজ আমিষের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। প্রাণীজ আমিষের উত্তম উৎস মৎস্য সম্পদ। দেশের আমিষের চাহিদার প্রায় ৬৩% পূরণ হয় মৎস্য সম্পদ হতে। GDP তে এর অবদান প্রায় ৫-৬%। বাৎসরিক রপ্তানী আয়ের প্রায় ৬% অর্জিত হয় মৎস্য থেকে। মাছ একটি দ্রুত পচনশীল খাদ্য সামগ্রী। এর মান বা গুণাগুণ নির্ভর করে অবতরণ, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, বিপণনের সামগ্রিক স্বাস্থ্যসম্মত প্রক্রিয়ায় এবং আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর। তাই এর জন্য স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ ও বিপণনের সুবিধাদি স্থাপন করা আবশ্যক। বর্তমানে উন্নত যোগাযোগ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ধৃত মাছ বাজারে পৌছানোর পূর্বেই নষ্ট হয়ে যায়। আধুনিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের অভাবে এবং যত্রতত্র মৎস্য অবতরণের ফলে আমাদের জনবহুল দেশের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এবং মাছের গুণগত মানও বিনষ্ট হচ্ছে। ফলে দরিদ্র জেলে সম্প্রদায় ও উৎপাদনকারী ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত এবং নিম্ন মানের মাছ খেয়ে স্বাস্থ্য হানির সম্মুখীন হচ্ছে। মাছের গুণগতমান রক্ষার্থে নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা অপরিহার্য।

ক) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা (Cleanliness)
খ) সতর্কভাবে নাড়াচাড়া করা (Careful handling)
গ) দ্রুত হিমায়ন (Fast cooling)

উপরোক্ত তিনটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা যথাযথ ভাবে পালন করা হলে ভোক্তাদের নিকট সল্প সময়ে সুলভ মূল্যে গুণগত মান সম্পন্ন টাটকা মাছ পৌছানো সম্ভব হবে। মাছের পুষ্টিমান তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় সারা বিশ্বের ভোক্তাদের নিকট মাছের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাছের গুণগতমান বজায় রেখে যথাসম্ভব টাটকা অবস্থায় বাজারজাত করণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা বাঞ্ছনীয়। মাছের যথাযথ পরিবহন, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণে অবহেলার দরুন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মাছের গুণগতমান নষ্ট হয়ে বিপুল পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। সঠিক পদ্ধতিতে মাছ সংরক্ষণই মাছের গুণগত মান বজায় রাখার পূর্ব শর্ত।

আধুনিক মৎস্য অবতরণের সুবিধাদি স্থাপন ব্যয় বহুল এবং প্রকৃতপক্ষে সেবামূলক কার্যক্রম হওয়ায় বেসরকারী উদ্যোক্তাগণ এক্ষেত্রে আগ্রহী নন বিধায় সরকারী উদ্যোগে মৎস্য অবতরণ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাদি গড়ে তোলা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন একাধিক মৎস্য অবতরণ ও বাজারজাতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এগুলো কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বরিশাল, খুলনা, পাথরঘাটা ও মনোহরখালীতে অবস্থিত। এ কেন্দ্রগুলো মৎস্যজীবিদেরকে পরি সেবা প্রদান করে বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক পর্যায়ে পরিচালিত হচ্ছে ।

বাংলাদেশে মৎস্য বাজারজাতকরণের সার্বিক অবস্থা

চাহিদার তুলনায় মাছের সরবরাহে সল্পতার কারণে এ দেশে অভ্যন্তরীণ বাজারে মাছের ক্রেতাদের কাছে সংগৃহীত সম্পূর্ণ মাছ বিক্রয় হয়ে যায়। দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রেতা রয়েছে বিধায় অতি সহজেই বিভিন্ন মানের/ধরনের মাছ ক্রয়/বিক্রয় করা যায়। এ দেশের মাছের বাজার সাধারণত মৎস্য ব্যবসায়ী/আড়তদার/ সমবায় সমিতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। প্রায় সর্বক্ষেত্রে মাছের বাজার অবৈজ্ঞানিক, নোংরা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং দুর্বল ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়ে থাকে। এ সকল বাজারে মাছ যথাযথভাবে উঠানো নামানো, ধোয়া, বরফ দেয়া বা পুনঃ বরফজাতকরণের সুব্যবস্থা নেই। চাষী ও মৎস্য ব্যবসায়ীগণ মৎস্য আহরণ পরবর্তী (Post harvest) সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনায় মোটেই আগ্রহী নয়। তারা কেবলমাত্র জেলে সম্প্রদায় এবং ভোক্তাদের ব্যবহার করে অধিক লাভবান হতে চান। শহরের ও গ্রামাঞ্চলের মাছ বাজারগুলো মৎস্য ব্যবসায়ী দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এ সকল বাজারে আধুনিক অবকাঠামো গড়ে উঠেনি। কোথাও কোথাও খোলা আকাশের নিচে মাটিতে বা চাটাইয়ের উপর মৎস্য অবতরণ করা সহ বাঁশের ঝুড়িতে/ ড্রামে করে পাইকারী বেচাকেনা ও পরিবহন সম্পন্ন করে।

শহরের মাছ বাজার পৌরসভা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। বাজারগুলোতে পর্যাপ্ত সুবিধাদি বিরাজমান নেই। স্থানীয় সরকার ইদানিং প্রকৌশল অধিদপ্তর LGED পল্লী অঞ্চলে

শুধুমাত্র নিম্নমানের সংরক্ষণ, পরিবহন ও বিপণন ব্যবস্থার কারণে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বছরে প্রায় ৩০ কোটি টাকা সমমূল্যের প্রায় ৯ হাজার মেঃ টন মাছ নষ্ট হয়ে যায়। উত্তরবঙ্গে বছরে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টন মাছ উৎপাদন/বাজারজাত হয়ে থাকে। গুণগতমান সংরক্ষণ করে মাছ পরিবহন ও বাজারজাতকরণের জন্য বিপুল পরিমাণ বরফের প্রয়োজন। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের উল্লেখিত রিপোর্টে বছরে মাত্র ৫০ টন বরফ ব্যবহারের কথা উল্লেখ রয়েছে। যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। বগুড়াতে ক্ষুদ্র কয়েকটি বরফকল এবং অন্যান্য স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আইসক্রিম ফ্যাক্টরী থেকে যে বরফ উৎপাদন/ সরববরাহ হয় তার দাম পড়ে প্রতি টন প্রায় তিন হাজার টাকা। অথচ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বরফকল স্থাপনের মাধ্যমে বরফ উৎপাদনে ব্যয় হয় এর চেয়ে অনেক কম।

বর্তমান বিশ্বায়ন পরিস্থিতিতে ই,ইউ ফুড রেগুলেশন এবং মার্কিন ফুড এন্ড ড্রাগ প্রশাসনের বিধি অনুযায়ী মাছ সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণে যথাযথ গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ করা অতীব প্রয়োজন। ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনে প্রচারের মাধ্যমে দেশব্যাপী জেলে/চাষী/ভোক্তা পর্যন্ত সকল স্তরের জনগোষ্ঠীকে মাছের মান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতন এবং উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি এবং অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে মাছের Post harvest loss কমানোর প্রয়াস নেয়া বাঞ্ছনীয়।

সুপারিশ

(১) প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সারা দেশে মৎস্য অবতরণ ও বাজারজাতকরণের সুবিধাদি (Marketing Net work) বিস্তার ঘটানো একান্ত প্রয়োজন।

(২) সরকারী উদ্যোগে মৎস্য অধিদপ্তর (DOF), বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (BFDC), স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল বিভাগ (LGED) সিটি কর্পোরেশনে, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে আধুনিক সুবিধা সম্বলিত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ও বাজার নির্মাণ পূর্বক ও যৌথ ব্যবস্থাপনা/ সরকারি/বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করা যেতে পারে।

(৩) অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানী বাজারের ক্ষেত্রে মাছের গুণগতমান বজায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে সচেতনার সৃষ্টি করতে হবে। এ কাজের জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে (রেডিও, টিভি, পত্রিকা) প্রচারণা চালাতে হবে। এজন্য এনজিও দেরও সম্পৃক্ত হতে হবে।

(৪) বর্তমানে চালু মৎস্য বাজারগুলো আধুনিকায়ন/ সংস্কারের মাধ্যমে ই,ইউ, Europian Union (EU), হ্যাসাপ Hazards Analysis of Critical Control Point (HACCP) মানে উন্নীত করতে হবে।

(৫) আধুনিক সুবিধাদি সম্পন্ন (হ্যান্ডলিং, বরফ প্রয়োগ, সংরক্ষণ ও পরিবহন ইত্যাদি) মৎস্য বাজার স্থাপনপূর্বক, মৎস্য অবতরণ ও বাজারজাতকরণ সুবিধাদি সম্প্রসারণ করা অবাশ্যক।

(৬) মৎস্য আহরণ পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি (Post Harvest loss) কমানোর জন্য তৃণমূল পর্যায়ে প্রশিক্ষণ মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

৭) উপযুক্তস্থানে মৎস্য সংরক্ষণাগার (Fish Storage) স্থাপন করতে হবে।

শেষ কথা

মৎস্য ও হিমায়িত খাদ্য রপ্তানী করে প্রতি বছর প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার আয় হচ্ছে। দেশীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ২০০০ কোটি টাকা। তাই জাতীয় স্বার্থে এই সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও মান নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। সরকারি/বেসরকারি পর্যায়ে এর প্রতি যথার্থ দৃষ্টি নিবদ্ধ করা সময়ের দাবী।

বৃদ্ধি করে, যেমন; বর্তমানে যদি বার্ষিক হেক্টর প্রতি মাছের উৎপাদন ১-২ মে. টন হয় তবে তা বৃদ্ধি করে ৩ মে. টন বা ততোধিকে উন্নীত করা।

২. ১ মৎস্যগ্রাম নির্বাচন

মৎস্যগ্রাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা হয় (সম্ভাব্য মাস ডিসেম্বর-জানুয়ারি) ঃ

- প্রায় ২৫ জন আগ্রহী চাষী থাকতে হবে- পুকুর মালিক, লীজ গ্রহীতা, কিংবা ধানক্ষেত বা পেনে চাষ করতে ইচ্ছুক অথবা পোনা চাষী বা পোনা ব্যবসায়ী, যে কেউ হতে পারেন,
- স্থানীয় বাসিন্দা/গ্রামবাসী/জনপ্রতিনিধি বা স্থানীয় নেতৃবৃন্দের আগ্রহ ও সহযোগিতার মনোভাব,
- মৎস্য কর্মীর সাথে এলাকাবাসী/মাছ চাষীদের যোগাযোগ,
- গ্রামে বা পার্শ্ববর্তী গ্রামে পোনা চাষি বা ব্যবসায়ীর উপস্থিতি আছে কি না যাদের কাছ থেকে পোনা ক্রয় করা সম্ভব।

২. ২ উদ্বুদ্ধকরণ সভা

মৎস্য গ্রাম নির্বাচনের পর চাষীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রথমে একটি উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন করা হয় (সম্ভাব্য মাস-ফেব্রুয়ারি/ মার্চ)।

এ সভার মূল উদ্দেশ্য-

- গ্রামের সকল মাছ চাষীদের একত্রিত করার মাধ্যমে সাধারণভাবে তাদের এবং সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীর মাছ চাষে আগ্রহ সৃষ্টির একটি পরিবেশ তৈরি করা
- মাছ চাষের ক্ষেত্র ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ-এজন্যে উপস্থিত চাষীদেরকে সভার কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করানোর মাধ্যমে তাদের মতামতকে মূল্যায়ন করা হয়
- পুকুর মালিকদের মধ্য থেকে উদ্যোগী ব্যক্তি চিহ্নিত করে প্রতিনিধি নির্বাচন করা, প্রকল্পের ও উপজেলা অফিসের সহায়তায় পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা
- স্থানীয় মসজিদের ইমাম, মুরুব্বী, জনপ্রতিনিধিদের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করানো ও সহায়তা কামনা করা, প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা/ গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা
- মৎস্য গ্রামের সফলতার সাথে কর্মসংস্থান, মহিলাদের অংশগ্রহণ, পুষ্টি চাহিদা পূরণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা।

২. ৩ জরিপ কার্য সম্পাদন

নির্ধারিত জরিপ ফর্মে প্রতিটি গ্রামে মৎস্যচাষী ও পুকুর সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হয় (সম্ভাব্য সময় -মার্চ -এর ১ম/২য় সপ্তাহ)।

৩. প্রশিক্ষণ

নির্বাচিত মৎস্যচাষীদের দুই বছরে বিভিন্ন ধাপে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রথম বৎসরে তিনটি কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং পরবর্তী বৎসরে দু'টি ফলোআপ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৩. ১ কারিগরি প্রশিক্ষণ

কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চাষীদের চাহিদা ও মাছ চাষ এর বিভিন্ন ধাপের সময়ানুগ হতে হবে। প্রকল্প থেকে তিনটি ধাপে পুকুর পাড়ে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

- বিভিন্ন ধরনের জলাশয় (যেমন ঃ পুকুর, ধানক্ষেত, পেন ইত্যাদি) অনুযায়ী এবং পানির ধারণক্ষমতা (মৌসুমী অথবা বাৎসরিক), পুকুরের উর্বরতা, চাষীর আগ্রহ ও সামর্থ, এলাকাভিত্তিক চাষোপযোগিতা, ইত্যাদি বিষয়সমূহ যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে প্রজাতি নির্বাচন, মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ, খাবার ও সার প্রয়োগের পরামর্শ দেয়া হয়।
- সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা, ক্ষেত্র সহকারি নিজ নিজ এলাকা (গ্রাম) ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক এ প্রশিক্ষণ আয়োজন ও পরিচালনা করে থাকেন। সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দলনেতা হিসাবে এ সকল প্রশিক্ষণ পরিচালনায় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করেন এবং সমন্বয় সাধন করেন।

ক. প্রথম প্রশিক্ষণ ঃ চাষীগণ কর্তৃক পুকুর প্রস্তুতি শুরু করার পূর্বে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় (সম্ভাব্য সময়- মার্চের ৩য়/৪র্থ সপ্তাহ; প্রশিক্ষণ মেয়াদ- ৪ ঘন্টা)।

প্রশিক্ষণের অন্তর্ভূক্ত বিষয়সমূহ ঃ

তাত্ত্বিক	ব্যবহারিক/অংশগ্রহণমূলক
পুকুর মেরামত/ সংস্কার ও আগাছা দমন	প্রাথমিক ধারণা লাভ ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ
রাক্ষুসে ও বাজে মাছ দূরীকরণ	রাক্ষুসে ও বাজে মাছ নিধনের জন্য রোটেনন প্রয়োগ (অনুশীলন) (মাত্রা নির্ধারণ/প্রয়োগ পদ্ধতি/সর্তকতা ইত্যাদি)
চুন ও সার প্রয়োগ	চুন প্রয়োগ ও সার প্রয়োগ (অনুশীলন) (মাত্রা নির্ধারণ/প্রয়োগ পদ্ধতি/সর্তকতা ইত্যাদি)
প্রজাতি নির্বাচন ও মজুদ ঘনত্ব (জলাশয় অনুযায়ী) নির্ধারণ	বিভিন্ন প্রজাতির পোনা প্রদর্শন ও পোনা ছাড়া (সম্ভব হলে অনুশীলন) বিভিন্ন খাদ্যাভ্যাস সম্বলিত মাছের ছবি প্রদর্শন
মজুদ পরবর্তী সার ও খাদ্য প্রয়োগ	বিভিন্ন প্রকার উপকরণ প্রদর্শন ও সনাক্তকরণ (পাথুরে চুন, কুঁড়া, খৈল, ভূষি, ইউরিয়া, টিএসপি ইত্যাদি)
রেকর্ড বই সংরক্ষণ ও লিপিবদ্ধকরণ	রেকর্ড বই লিপিবদ্ধকরণ অনুশীলন

প্রথম প্রশিক্ষণ ঃ (সম্ভাব্য মাস- ফেব্রুয়ারি/মার্চ; মেয়াদ-২ ঘন্টা)

তাত্ত্বিক	ব্যবহারিক/অংশগ্রহণমূলক
পুকুর প্রস্তুতির বিভিন্ন ধাপ (রোটেনন, চুন ও সার এর প্রয়োগ মাত্রা নির্ধারণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি, সর্তকতা ইত্যাদি)	বিভিন্ন উপকরণ প্রদর্শন ও চাষী কর্তৃক সনাক্তকরণ (অনুশীলন)
মজুদ পূর্ববর্তী কার্যক্রম চুন, সার প্রয়োগ	অর্জিত ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা, সুফলভোগীদের মতামত গ্রহণ এবং স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
পোনা মজুদ/মজুদ ঘনত্ব	
মজুদ পরবর্তী কার্যক্রম (পুকুর পর্যবেক্ষণ, খাদ্য পরীক্ষা, সার প্রয়োগ ইত্যাদি)	
খাদ্য রিং/খাদ্য প্রয়োগ	
মাছ চাষের সাধারণ সমস্যা	
নমুনায়ন	

দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ ঃ (সম্ভাব্য মাস-আগস্ট/সেপ্টেম্বর; মেয়াদ- ২ ঘন্টা)

তাত্ত্বিক	ব্যবহারিক/অংশগ্রহণমূলক
মাছের সাধারণ রোগ-ব্যাধি ও প্রতিকার	রোগাক্রান্ত মাছের ছবি প্রদর্শন করে চাষীদের দ্বারা রোগ সনাক্তকরণ
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা -বিভিন্ন ঝুঁকি ও প্রতিকার	ঝুঁকি সম্বলিত ফ্লাসকার্ড, ছবি প্রদর্শন ও চাষিদের দ্বারা ঝুঁকি সনাক্তকরণ
মাছ আহরণ/আংশিক আহরণ ও পুনঃমজুদ	আংশিক আহরণে অংশগ্রহণ করানো
আয়-ব্যয় ও মুনাফা	আয়-ব্যয়ের হিসাব নির্দিষ্ট চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন ও সকলকে অংশগ্রহণ করান এবং সার্বিক কর্মকাণ্ড ও ফলাফল মূল্যায়ন। সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রামের অন্যান্য পুকুর মালিকের কাছে ছড়িয়ে পড়েছে কিনা সে সম্পর্কে আলোচনাকরণ।

৪. মৎস্য গ্রামের আওতায় অন্যান্য কার্যক্রমঃ

এছাড়া মৎস্যগ্রামের আওতাধীন অন্যান্য কার্যক্রম সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

৪.১ চাষী রের্কড বই সংরক্ষণ ঃ

মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনায় আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা এবং এর ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা। চাষী রেকর্ডবই সংরক্ষণ পদ্ধতি এক নজরে নিম্নরূপ ঃ

- প্রথম কারিগরি সভায় রেকর্ড বই প্রদান।
- রেকর্ড বই পূরণ ও সংরক্ষণে চাষীদের সহায়তা
- মৎস্যগ্রাম পরিদর্শনের সময় রেকর্ড বই যাচাই
- মাঠ পরিদর্শনের সময় উপজেলা টিমের সদস্যগণ কর্তৃক পরিদর্শিত চাষীর রেকর্ড বইয়ে স্বাক্ষর প্রদান

৪. ২ চাষি রেজিষ্টার সংরক্ষণ ঃ

বাস্তবায়িত কার্যক্রমের তথ্যাদি রেজিস্টার লিপিবদ্ধ করণ এবং পরবর্তীতে মূল্যায়নের ভিত্তিতে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ। চাষী রেজিস্টার সংরক্ষণ পদ্ধতি এক নজরে নিম্নরূপঃ

- নির্ধারিত ছকপত্র অনুযায়ী চাষী রেজিস্টার সংরক্ষণ
- প্রথমে মহিলা চাষীর নাম লেখা
- বছরওয়ারী চাষীর উৎপাদন তথ্যাদি সংরক্ষণ

৪.৩ মৎস্যগ্রাম দলনেতাদের সভা ঃ

মৎস্যগ্রামের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পরবর্তী পদক্ষেপগ্রহণের জন্য দলনেতাদের সমন্বয় সভা আহ্বান করা হয়।

সভা আহ্বান করণীয় পদক্ষেপের নিয়মাবলী নিম্নরূপ ঃ

◊ দুই মাস অন্তর মৎস্যগ্রামের দলনেতাদের সাথে সভা
◊ সভার কার্যবিবরণী রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা
◊ কার্যবিবরণীর ফটোকপি প্রেরণ
➢ প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক
➢ উপ-পরিচালক
➢ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
◊ পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি বিষয়ে পরবর্তী সভায় আলোচনা করা।

৪.৪ স্থানীয় মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মী (Local Extension Agents for Fisheries) নির্বাচন ঃ

চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের মৎস্য গ্রাম কার্যক্রমের স্থায়িত্বশীলতার নিমিত্তে স্থানীয় মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মী নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রাথমিক কার্যাদি ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ৩০ টি জেলা হতে মোট ৯০ জন স্থানীয় মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মী নির্বাচনের মাধ্যমে পাইলট প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।

৪.৫ মৎস্যগ্রামে নির্দেশিকা বোর্ড স্থাপন ঃ

প্রতিটি মৎস্যগ্রামে সাইনবোর্ড ও পুকুর কোড প্লেট এর পাশাপাশি মৎস্যচাষ সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্বলিত

রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

মোঃ মোকাম্মেল হোসেন

এ দেশ হতে মৎস্য পণ্য রপ্তানি বাণিজ্য শুরু হয় পঞ্চাশের দশকে। তখন থেকেই এ দেশের এই পণ্য হিমায়িত করে আমেরিকা ও ইউরোপীয়ান দেশসমূহে রপ্তানির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যাত্রা শুরু হয়। তৎকালীন সময়ে এ দেশে ৯টি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ছিল। যার দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৫৮ মেট্রিক টন । স্বাধীনতার পর বিগত ৩২ বৎসর ধরে মৎস্য পণ্য রপ্তানী করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বর্তমানে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য দেশের রপ্তানী আয়ের ক্ষেত্রে ২য়স্থানে অবস্থান করছে। এখানে উল্লেখ্য যে মৎস্য পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ওৎপ্রতভাবে জড়িত। বর্তমানে বাংলাদেশে ১২৯টি মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা রয়েছে। ১৯৭১-৭২ সালে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ২৩.৮০ কোটি টাকা। ২০০১-২০০২ সালে ১৬৩৭.১৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে। এর মধ্যে একমাত্র চিড়িংর অবদান ৮৪%।

সারা বিশ্বে ক্রেতাদের বা ভোক্তাদের চাহিদা অনুসারে পণ্য সরবরাহ করার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পণ্য প্রক্রিয়াজাত করা হয়। সাধারণত হিমায়িত করে, বরফায়িত করে, জীবন্ত, লবণ মিশ্রিত, ধূমায়িত ও শুকিয়ে শুটকী করে মাছ প্রক্রিয়াজাত ও রপ্তানি করা হচ্ছে। বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত পণ্যের ৩৯.০৬% রপ্তানী হয় আমেরিকা, ৪৮.৫১% ইউরোপ, ৯.৩২% জাপান এবং অবশিষ্ট পণ্য থাইল্যান্ড ও অবশিষ্ট অংশ মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে ।

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানী স্পর্শকাতর ব্যবসা। এই পণ্যের উৎপাদনের উৎসস্থল হতে সম্ভাব্য সংক্রমণ, দূষণ এর নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে ঝুঁকিহীন নিরাপদ খাদ্য তৈরি এবং তা ভোক্তাদের চাহিদা অনুসারে সরবরাহ করা সম্ভব নয়। অধিক বৈদেশিক মুদ্রা আনয়নের স্বার্থেই মৎস্য ও মৎস্য পণ্য রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা আবশ্যক। আর এ কাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হলে ১ম যে বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে তা হল সুষ্ঠু মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করণ।

রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণ বিষয়টির কর্মপরিধি ব্যাপক এবং এর ব্যাপ্তি সারা বিশ্বজুড়ে। রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণ করতে হলে প্রথমে মান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে এবং সম্প্রসারণ কর্মসূচির আওতায় সারা বিশ্বজুড়ে এর প্রচার চালাতে হবে। এ সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর কে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কাজ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। যে যে সংস্থা বা অধিদপ্তর বা মন্ত্রণালয় এ সম্প্রসারণ কাজে সম্পৃক্ত হতে পারে। তা হল ঃ

ক্র:নং	প্রতিষ্ঠান	সুফলভোগী	ও অন্যান্য
১।	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়	প্রক্রিয়াজাতকারী	গ্রাহক স্থানীয় ও বৈদেশিক চাহিদা পূরণ
২।	মৎস্য অধিদপ্তর	রপ্তানীকারী	ক্রেতা স্থানীয় ও বৈদেশিক ভোক্তার পণ্যের মান নিশ্চিতকরণ
৩।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	উৎপাদনকারী	বিদেশী ক্রেতাদের সাথে সমন্বয় করা এবং নতুন ক্রেতার সন্ধান করা।
৪।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	রপ্তানীকারক	দূতাবাসের মাধ্যমে প্রচার চালানো
৫।	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	রপ্তানিকারক	সেমিনার সিম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা করা এবং পণ্যের নতুন বাজার খোঁজা।
৬।	হিমায়িত মৎস্য খাদ্য রপ্তানী সংস্থা	সরবরাহকারী ও উৎপাদনকারী	চাষ হতে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতের প্রতিটি পর্যায়ে মনিটর করা।
৭।	বিএসএস আই আর	প্রক্রিয়াজাত পণ্য	আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুসারে পণ্যের মানদন্ড নির্ধারণ করা।
৮।	আইসিডি আর বি	প্রক্রিয়াজাত পণ্য	পণ্যের অনুজীব সংক্রান্ত কাজে সহায়তা করা। রেফারেন্স পরীক্ষাগার হিসাব কাজ করা।
৯।	বিএফডিসি	প্রক্রিয়াজাত পণ্য	অভ্যন্তরীণ বাজারে বিপণন বাজারজাতকরণ এবং স্বাস্থ্য সম্মত ল্যান্ডিং এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
১০।	বিএফআরআই	চিংড়ি/ মৎস্য চাষীদের সহায়তা করা	গবেষণা মাধ্যমে উন্নত মৎস্য পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্র তৈরি
১১।	গণমাধ্যম	চাষীদের সচেতনাতা বৃদ্ধি করা।	পোস্ট হারভেস্ট ঝুঁকি নিরূপণ করা গণ সচেতনতা সৃষ্টি করা।

জনবলসহ স্বাস্থ্যসম্মত কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাত কারখানায় গ্রহণ করা। প্রতিটি কারখানা হতে উন্নতর পরিবহনের মাধ্যমে মাঠ হতে সরাসরি কাঁচামাল কারখানায় আনয়ন নিশ্চিত করা। এছাড়া যে সমস্ত অবতরণ কেন্দ্রে ও আড়তে মৎস্য ও চিংড়ি অবতরণ করে সেগুলির মান উন্নয়ন করা বিশেষভাবে পানি, বিদ্যুত, পরিবহন সুবিধাদি স্বাস্থ্যসম্মত করা।

উপরোক্ত প্রধান চালিকা শক্তির সুষ্ঠু বাস্তবায়নে গুণগত মান সম্পন্ন মৎস্য পণ্য উৎপাদনে প্রক্রিয়াজাত কারখানাসমূহ অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখার ফলে রপ্তানি বাণিজ্যে ধনাত্বক প্রভাব পড়বে বলে আমাদের বিশ্বাস। নিম্নে ধনাত্বক প্রভাবের প্রবাহ চিত্র তুলে ধরা হল।

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের (মৎস্য অধিদপ্তর) মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি

প্রক্রিয়াজাত কারখানা হতে মান সম্মত মৎস্য জাত দ্রব্যাদি উৎপাদন

উৎপাদিত দ্রব্যাদিতে দূষণের ঝুঁকি কমবে

বশ্ব বাণিজ্যে দেশের দ্রব্যাদির মান উন্নয়ন ও রপ্তানী বৃদ্ধি পাবে।

কর্মসংস্থান বৃদ্ধি

গুণগত দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি

রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন

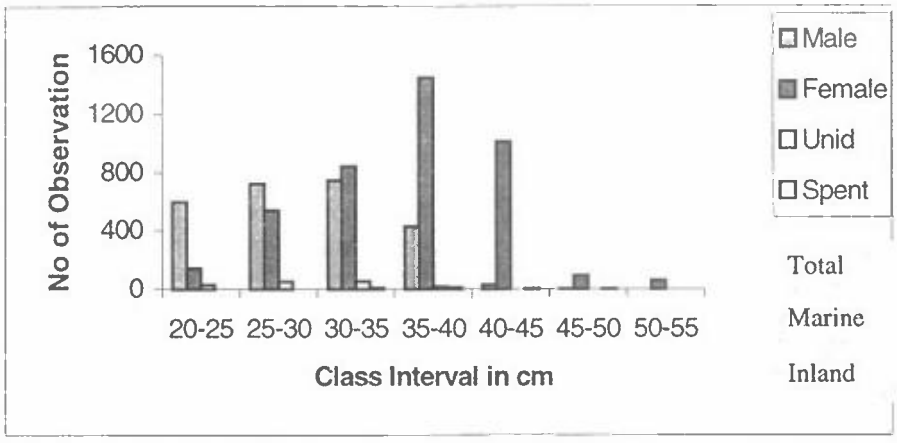

চিত্র-১: বাংলাদেশে ইলিশ মাছ উৎপাদনের পরিমাণ (১৯৮৩/৮৪-৯৮/৯৯)

ফলে ভবিষ্যতে দেশে ইলিশ মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইতোমধ্যে ভারত ও মায়ানমারে ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ইদানিং মায়ানমার হতে ইলিশ মাছ বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ইত্যাদি দেশে রপ্তানিও হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ইলিশ মাছের সহনশীল উৎপাদন ও ইলিশের পরিবেশ সংরক্ষণ করা অতীব জরুরী।

ইলিশ মাছের জীববিদ্যা

ইলিশ মাছ সাধারণত সমুদ্রের লবণাক্ত পানি হতে মিঠা পানিতে এবং মিঠা পানি হতে সমুদ্রে চলাচল করে থাকে, উপকূলীয় এলাকায় স্কুলিং হয় এবং নদ-নদীর প্রায় ১২০০-১৩০০ কি:মি: উর্ধেও ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। গঙ্গা এবং কয়েকটি বড় নদীতে ইলিশ স্থায়ীভাবে বসবাস করে। ইলিশ মাছ অত্যন্ত দ্রুত সাতাঁর কেটে থাকে। দিনে প্রায় ৭১ কি:মি: পর্যন্ত পরিভ্রমণ করতে পারে।

ইলিশ মাছ মূলত প্লাঙ্কটন ভোজী। ইলিশ মাছের গিল র‍্যাকার প্রায় চালুনির মত। তাই খাদ্যের তালিকায় বিশেষ কোন নৈর্বাচনিকতা নেই। খাদ্য তালিকায় অ্যালজি, বালুকণা, ডায়াটম, রটিফার, ক্রাস্টাসিয়া, প্রোটোজোয়া এবং অন্যান্য মিশ্র দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়েছে। ইলিশ মাছের আকার, বয়স ও পরিবেশ ভেদে খাদ্য গ্রহণের মাত্রার তারতম্য হয় এবং প্রজনন ঋতুতে খাদ্য গ্রহণ থেকে প্রায় বিরত থাকে।

ইলিশ মাছ সাধারণত ১^{+} বৎসর বয়সে পরিপক্কতা লাভ করে। তবে আবহাওয়ার তারতম্য ও অন্যান্য কারণে অনেক সময় ৮-১০ মাস বয়সেও ইলিশ মাছ পরিপক্ক হতে পারে। স্থান, সময় ও আকার ভেদে পুরুষ ও স্ত্রী ইলিশ মাছের অনুপাত ভিন্ন হয়ে থাকে। সাধারণত ২০-২৫ সে: মি: দৈর্ঘের অধিকাংশ মাছই পুরুষ এবং ৪২-৪৫ সে:মি: এর চেয়ে বড় অধিকাংশ ইলিশ মাছই স্ত্রী (চিত্র-২)।

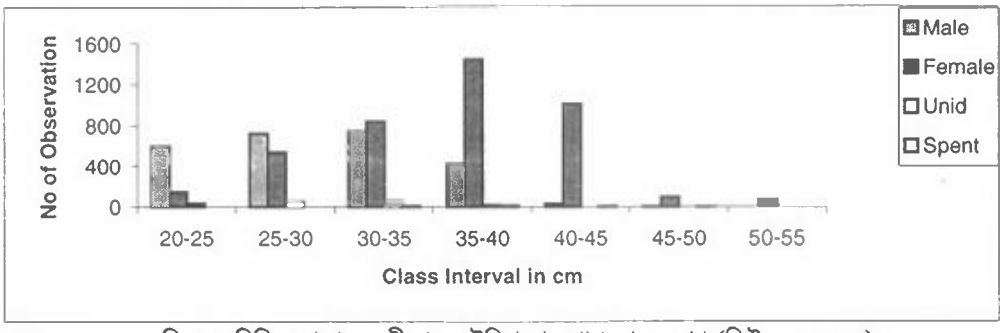

চিত্র-২: বিভিন্ন আকারের স্ত্রী-পুরুষ ইলিশ মাছ প্রাপ্যতার সংখ্যা (জিইএফ-২০০০)

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বড় পূর্ণিমার জোয়ারের সময় প্রধান প্রধান প্রজনন ক্ষেত্রে কিছুদিন মাছ আহরণ বন্ধ রাখা আবশ্যক। মেঘনা নদীর মোহনায় ইলিশ মাছের প্রধান প্রধান প্রজনন ক্ষেত্রে উক্ত বড় পূর্ণিমার ১০ দিনের এক জো (১লা আশ্বিন হতে ১০ ঐ আশ্বিন পর্যন্ত) ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ করার আইন প্রণয়নের উদ্যোগ ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।

২. জাটকা সংরক্ষণ

জাটকা হচ্ছে ইলিশ মাছের নতুন প্রজন্মের প্রবেশন স্তর। তাই "জাটকা ধরা হলে ইলিশ মাছ লোপ পাবে" (Jatka caught, hilsa is lost)। জাটকা নিধন বন্ধ করার জন্য দেশে প্রচলিত মৎস্য সংরক্ষণ আইন (হিলশা) বাস্তবায়ন অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের পাশাপাশি নেভি, কোস্ট গার্ড দলকে নিয়োজিত করা সহ আইন সংশোধন (কারেন্ট জাল উৎপাদন, বাজারজাত নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি) এবং আইন লংঘনকারীদের শাস্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আগামী বৎসরগুলিতে উক্ত আইন বাস্তবায়ন **কার্যক্রম আরও জোরদার এবং কঠোর করা হবে**। কোন জলাশয়ের মাছের জীববৈচিত্র সংরক্ষণের সহজতম ও কার্যকর পদ্ধতি হচ্ছে অভয়াশ্রম ঘোষণা করা। জাটকা সহ অন্যান্য মাছের জীববৈচিত্র সংরক্ষণের জন্য জাটকা মাছের প্রধান বিচরণ ক্ষেত্র **মেঘনা নদীর ষাটনল হতে চর আলেকজান্ডার পর্যন্ত** এবং **কলাপাড়া উপজেলার আন্ধারমানিক নদীতে যথাক্রমে প্রতি বৎসর মার্চ-এপ্রিল এবং নভেম্বর-জানুয়ারি মাস পর্যন্ত অভয়াশ্রম ঘোষণার জন্য ইতোমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।**

৩. ইলিশ মাছের প্রজাতিগত বৈচিত্র সংরক্ষণ

চন্দনা ইলিশ এবং হিলশা কেলি/কানাগুর্তা প্রজাতির আহরণমাত্রা বাংলাদেশে হ্রাস পাচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের অভিমত। তাই ইলিশ মাছের সহনশীল উৎপাদন বজায় রাখার জন্য উক্ত দুইটি প্রজাতির আহরণ মাত্রা, বিস্তার ও জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা কাজ সম্পাদন করে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন।

৪. ইলিশ মাছের অতি আহরণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণ

সহনশীল মাত্রার চেয়ে বাংলাদেশে ইলিশ মাছ প্রায় ৩০-৩৫% অতিরিক্ত আহরণ (Over exploitation) করা হচ্ছে। কোন প্রাকৃতিক পপুলেশন হতে অতিমাত্রায় মাছ আহরণ করা হলে উৎপাদনের গতিধারা সঠিক থাকে না এবং দীর্ঘ সময় ধরে এ অবস্থা চলতে থাকলে ঐ পপুলেশন লোপ বা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কাজেই ইলিশ মাছের অতি আহরণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

- ফাঁস জালের ফাঁসের আকার নিয়ন্ত্রণ;
- ইলিশ জেলে ও মাছ ধরার নৌকা নিবন্ধীকরণ ও ইলিশ আহরণের জন্য নতুন জেলেদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ।

আমাদের দেশে প্রধানত ফাঁস জাল দিয়ে ইলিশ মাছ ধরা হয় এবং ৫.০-৬.০ হতে ১২-১৪ সে:মি: ফাঁসের জাল সর্বাধিক ব্যবহার করা হয়। তবে ৭.০ হতে ১০.০ সে:মি: ফাঁসের জালে সবচেয়ে বেশি মাছ (৮০-৯০%) মাছ ধরা পড়ে। ৫.০-৬.০ সে:মি: আকারের ফাঁসে অপেক্ষাকৃত **ছোট এবং পুরুষ মাছ** (২০.০ হতে ২৮.৭ সে:মি) অন্যদিকে ১২.০-১৩.০ সে:মি: আকারের ফাঁসে **সবচেয়ে বড় এবং অধিকাংশ স্ত্রী মাছ ধরা পড়ে**। এ প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে ছোট এবং বড় আকারের **মাছ সংরক্ষণসহ অতি আহরণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং অধিক ডিম উৎপাদনের জন্য আমাদের দেশে ৮.০ হতে ১১.০ সে: মি: ফাঁসের ফাঁস জাল** ব্যবহারের প্রচলন করা যেতে পারে।

বর্তমানে ইলিশ জেলে ও নৌকার সংখ্যা নিবন্ধন করার কোন ব্যবস্থা নেই। **এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন**। এছাড়া দেশের সকল উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ ধরার অবাধ অধিকার (Open access) বলবৎ আছে। তাই জলাশয়ে অবাধ প্রবেশাধিকার পদ্ধতির পরিবর্তে **সমাজ ভিত্তিক জলমহল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন** করে ইলিশ ধরা কাজে নিয়োজিত জেলে ও নৌকার সংখ্যা নিবন্ধন করা সহ নতুন জেলেদের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ এবং অতি আহরণ মাত্রা হ্রাস করা যেতে পারে।

৫. ইলিশ মাছের আবাসস্থল ও পরিবেশ উন্নয়ন এবং সংরক্ষণের উপায়

পূর্বে বাংলাদেশের প্রায় সকল প্রধান নদ-নদীতে ইলিশ মাছ পাওয়া যেত। কিন্তু বর্তমানে দেশের বাইরে এবং ভিতরে নানাবিধ বাঁধ নির্মাণের ফলে পানি প্রবাহ হ্রাস, পলিভরাট, জলজ পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি কারণে ইলিশ মাছের ব্যাপক আবাসিক এলাকা ধ্বংস এবং অভিপ্রয়াণ পথে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে **ফেণী, ছোট ফেণী, মুহুরি, কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী, কালিগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, ধনু, কালি নদী, হুরাসাগর, কুমার, নবগঙ্গা, চিত্রা ইত্যাদি নদীর ইলিশ মাছের আবাসস্থল সম্পূর্ণরূপে এবং গড়াই, মধুমতি, আড়িয়াল খাঁ, ভৈরব, মহানন্দা এবং পদ্মা নদীর উপরের অংশের আবাসস্থল প্রায় ধ্বংসের পথে**। প্রতি বৎসর কৃষি জমি হতে প্রায় ২,৫০০-৩,০০০ মে: টন কীটনাশক ধৌত হয়ে বিভিন্ন জলাশয়ে পতিত হচ্ছে। কয়েক সহস্রাধিক শিল্প কারখানার অপরিশোধিত বিষাক্ত বর্জ্য, গৃহস্থালির বর্জ্য ও পয়:নিষ্কাশনের বর্জ্য সরাসরি বিভিন্ন নদ-নদী এবং

জাটকা ধরা বন্ধ হলে - ইলিশ সম্পদ

১০. ইলিশ ব্যবস্থাপনার জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা

ইলিশ মাছ বঙ্গোপসাগরের **একটি অভিন্ন** সম্পদ (Common resource)। বাংলাদেশ, ভারত এবং মিয়ানমারে ধৃত ইলিশ মাছ **একই পপুলেশন এবং একই মজুদ ভান্ডারের অংশ বিশেষ**। বাংলাদেশের ন্যায় ভারতের গঙ্গা নদীর অববাহিকার হুগলী-মাতলা মোহনা অঞ্চল, গোদাবরী, দয়া ইত্যাদি নদীতেও ইলিশ মাছের প্রজনন ক্ষেত্র আছে এবং প্রচুর পরিমাণে জাটকা ধরা পড়ে। কাজেই ইলিশের টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে যৌথ ব্যবস্থাপনা ও আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে। অন্যথায় এক দেশ এ মাছ সংরক্ষণের কাজ করে যাবে আর অন্য দেশ অতি আহরণে রত হলে আন্তঃদেশীয় কোন্দল সৃষ্টি হতে পারে। সাগর অঞ্চলে ইলিশ মাছের মজুদ বৃদ্ধির জন্য **নো-টেক জোন বা অভয়াশ্রম ঘোষণা**, যৌথ গবেষণা, পরিবেশ দূষণ এবং পরিবেশগত বিপর্যয় রোধ, পরস্পর তথ্যের আদান প্রদান এবং ইলিশের জন্য **একটি আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি সহযোগিতার মূল কেন্দ্র বিন্দু হতে পারে**। চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের জিইএফ কমপোনেন্ট হতে এ বিষয়ে একটি উদ্যোগ নেয়ার পরিকল্পনা আছে।

১১. ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য অধিদপ্তরে দক্ষ জনবল তৈরি ও জনবল অবকাঠামো জোরদার করণ

ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নের জন্য অধিদপ্তরে দক্ষ জনবল অপ্রতুল। ইলিশ বা মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য **মাঠ পর্যায়ে পৃথক কোন জনবল নেই**। উপজেলা পর্যায়ে মাত্র একজন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও একজন সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা সার্বিকভাবে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ, মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন সহ অন্যান্য সকল উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কাজ বাস্তবায়ন করে থাকে। এ প্রেক্ষাপটে ইলিশ মাছ সহ উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য উপজেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে যথাক্রমে সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা এবং সহকারী পরিচালক ও সদর দপ্তরে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/পরিচালকের (মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনা) একটি করে পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। বর্তমানে প্রাপ্ত জনবলের মধ্যে হতে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য ইতোমধ্যে ৪র্থ মৎস্য প্রকল্পের অধীনে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিভাগীয় প্রশিক্ষক তৈরির কাজ চলছে।

১২. ইলিশ ও জাটকা জেলেদের পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশের জেলে সম্প্রদায় ঐতিহ্যগত ভাবেই দরিদ্র। ইলিশ ও জাটকা ধরার জন্য তিনটি শ্রেণী যথা নৌকার মালিক, প্রধান মাঝি ও নাবিক জড়িত। নৌকার মালিক তার নৌকা ও জাল প্রধান মাঝিকে ভাড়া দেয়, মাঝি পরিচালনা করে এবং সাধারণ নাবিকগণ মাছ ধরে। নাবিক জেলেদের বাৎসরিক আয় মাত্র প্রায় ১৪,৪০০ টাকা যা অন্যান্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ের মাত্র ৩৭ ভাগ এবং জাতীয় গড় আয়ের মাত্র ২৫ ভাগ। ইলিশ ও জাটকা জেলেগণ বাংলাদেশের দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে। যে সমস্ত জেলে প্রধান পেশা হিসাবে ইলিশ মাছ আহরণের উপর নির্ভরশীল তাদের ৬০ ভাগের চাষ যোগ্য জমি নেই, বাসস্থানের গড় আয়তন মাত্র ০.০৭ একর। অনেক ক্ষেত্রে নিজস্ব বাসস্থানও নেই, ৬০ ভাগেরও বেশি লোক নিরক্ষর, তারা সম্পদহীন ও নিম্ন আয়ের শ্রেণীভুক্ত। বিকল্প কোন কাজ থেকে আয়-উপার্জনও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই জীবিকা নির্বাহ তথা বেঁচে থাকার জন্য তারা **জাটকা আহরণ করতে বাধ্য হয়**। একারণে ইলিশ ও জাটকা জেলেদের পুনর্বাসন করা অপরিহার্য।

উপসংহার ঃ

আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতির সাথে প্রাচীন কাল হতেই সম্পৃক্ত জাতীয় মাছ ইলিশকে সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্যে এর উৎপাদনকে স্থিতিশীল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

হবার পর মওজুদ পকুরে ছাড়ার **ব্যবস্থাপনার নামই** নার্সারী পুকুর ব্যবস্থাপনা।

গলদা চিংড়ির পুরুষ সাধারণত আকার বড় হয় এবং বৃদ্ধির হারও বেশি। পি.এল অবস্থায় পুরুষ স্ত্রী সনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব। তাই ১ মাস লালন পালনের পরে মোটামুটি ভাবে পুরুষ সনাক্ত করা সম্ভব হয়। তখন ইচ্ছা করলে ৯০% পুরুষ এবং ১০% স্ত্রী ছেড়ে একটি ভাল ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয়।

এ ছাড়া প্রাকৃতিকভাবে চিংড়ি নিজেরা নিজেদের খায়। তবে যদি ভাল পর্যাপ্ত খাবার থাকে এ স্বভাব আনেকাংশে কম হয়। নার্সারীতেও ভাল ও পরিমিত খাবার সরবরাহ করতে হয়। তাই প্রাথমিকভাবে অর্জিত স্বভাব পরবর্তী কালেও চাষ ব্যবস্থাপনায় কাজে লাগে।

নার্সারী থেকে মওজুদ পুকুরে ছাড়ার সময় নিরোগ সবল এবং বিকলাংগ পোনা বাছাই করে ছাড়া যায়। তাই গলদা চিংড়ি চাষের জন্য নার্সারী পুকুর স্থাপন অধিকতর জরুরী।

(ক) নার্সারী কি?

যে স্থানে পোস্ট লার্ভা/পোনা যত্ন সহকারে লালন করে ৫-৬ সেঃমিঃ পর্যন্ত বড় করা হয় উহাই নার্সারী পুকুর বা আতুড় পুকুর। নার্সারীর আয়তন ১-১.৫ বিঘা হলে ভাল।

(খ) নার্সারী কেন করব?

চিংড়ি পোনা সাধারণত পরিবেশের তারতম্যে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তাছাড়া দূর পাল্লায় পরিবহনজনিত করণে পোনা পীড়িত ও দুর্বল হয়ে পড়ে। এসব দুর্বল পোনা সরাসরি ঘেরে ছাড়া হলে অধিক হারে মারা যায়। পোনার মৃত্যুর হার কমানোর জন্য নার্সারীতে পোনা প্রতিপালনের উপকারিতা আছে। সেগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হল।

নার্সারীতে প্রচুর খাবার থাকে, পরিবহনকৃত দুর্বল পোনা সহজেই নতুন পরিবেশ মানিয়ে নিতে পারে, অল্প সময়ে পোনা শক্তিশালী ও বড় হয়, ক্ষতিকর প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, অবাঞ্ছিত চিংড়ি বাছাই করা যায়, পোনার মৃত্যুর হার নির্ণয় করা যায়, উৎপাদন নিশ্চিত করা যায়, সর্বোপরি মওজুদ পুকুরে সুস্থ ও সবল পোনা মওজুদ করা যায়।

(গ) নার্সারী নির্মাণঃ

তলদেশ এর মাটি পরীক্ষা করে শতাংশ প্রতি ১ কেজি, ২ কেজি ডলোচুন , বিঘাপ্রতি ৫ কেজি ৬০% ক্লোরিন সম্পন্ন ব্লিচিং পাউডার এবং ১০ কেজি মুরগির বিষ্ঠা ১ ফুট স্তরে ভাল করে কর্তন করে মিশাতে হবে। ভাল করে কর্তন করতে হবে। যাতে তলদেশের মাটি নরম হয়।এঁটেল দোঁয়াশ, বেলে দোঁয়াশ অথবা বেলে মাটিতে নার্সারী নির্মাণ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এসিড সালফেটযুক্ত কোন মাটিতেই নার্সারী নির্মাণ করা যাবে না। পাড়ের উচ্চতা প্লাবনমুক্ত হতে হবে।

(ঘ) একটি উপযুক্ত নার্সারীর বৈশিষ্ট্য ঃ

প্রচুর সূর্যের আলো পায়, পাড়ে কোন বড় গাছ, আগাছা থাকবেনা, আয়তন ১-১.৫ বিঘা হলে ভাল হয়। তলা সমতল হলে ভাল হবে, মজবুত বেড়ী বাঁধের বেষ্টনী থাকতে হবে, পানি সরবরাহের (আদান-প্রদানের) উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রাকৃতিক খাদ্য বিদ্যমান থাকতে হবে, রাক্ষুসে বা ক্ষতিকর প্রাণি থাকবে না, ৫০-৬০ সেঃ মিঃ পানি থাকতে হবে, পরিমিত পোনা একর প্রতি ৫০,০০০- ৬০,০০০

নার্সারী প্রস্তুতের জন্য প্রথমে জলজ আগাছা দমন করতে হবে। কারণ জলজ আগাছা মাছের জন্য ক্ষতিকর। প্রথমে পুকুরকে শুকিয়ে ফেলতে হবে। পুকুরের তলদেশের মাটির পি.এইচ পরীক্ষা করে চুন দেয়ার মাত্রা নির্ণয় করতে হবে। মাটির পি.এইচ ৬.৫ পর্যন্ত হলে শতাংশে প্রতি ১ কেজি চুন পুকুরের তলদেশে প্রয়োগ করে মাটির সংগে মিশিয়ে দিতে হবে। ৬.৫ এর কম হলে .০১ কম এর জন্য হেক্টরে অতিরিক্ত ৩৫ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে। মাটির চ পি.এইচ পরীক্ষার সময় কমপক্ষে ১ ফুট নিচের মাটি পরীক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। চুন প্রয়োগের পর মাটির উর্বরতা দেখে বিঘা প্রতি ৫০ কেজি পঁচা গোবর, ৫০ কেজি আর্বজনা পঁচা এবং মাটিকে শোধনের জন্য বিঘা প্রতি ৫-৭ কেজি ১ নং গ্রেডের ব্লিচিং পাউডার ভাল করে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে । গলদা চিংড়ির জন্য পুকুরের গভীরতা ১-১.২ মিটার সর্বোত্তম এবং আয়তনে ৪০০০- ৬০০০ বর্গমিটার হলে ভাল ব্যবস্থাপনায় আনা যায়। পুকুরের ঢাল বা Slope ১ঃ৩ হলে ভাল হয়।

নার্সারীতে পানি ও মাটির গুণগত মান নিম্নরূপ হওয়া দরকার।

(০০-১) মাটি ঃ

জৈব কার্বন=১.৫-২.০ (%), জৈব পদার্থ=২.৫-৪.৩ (৯মিলিগ্রাম /১০০ গ্রাম), নাইট্রোজেন=৮-১০ মিলিগ্রাম /১০০ গ্রাম, পিএইচ= ৬.৫-৮.৫, ফসফরাস=১০-১৫ মিলিগ্রাম/১০০ গ্রাম।

(০০-২) পানি ঃ

গভীরতা = ৫০- ৬০ সেঃ মিঃ, তাপমাত্রা= ২৫ ৩০ সেঃ, পিএইচ= ৭.৫-৮.৫, অক্সিজেন= ৫-৮.৫ পিপিএম।

ঙ) পানিতে সার প্রয়োগের মাত্রা নিম্নরূপ ঃ

প্রতি শতকে ইউরিয়া= ১০০ গ্রাম, টিএসপি=১০০ গ্রাম, ১ম বার সার প্রয়োগের ১ দিন পর পুনরায় সম পরিমাণ সার দিতে হবে। প্রতি শতকে ইউরিয়া= ১০০ গ্রাম,

বরেন্দ্র অঞ্চলে মৎস্য উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম

মোঃ আবদুল খালেক

'বরেন্দ্র' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ হল 'বর+ইন্দ্র = বরেন্দ্র'। এর সরল অর্থ দাঁড়ায় দেবরাজ ইন্দ্রের বর। অর্থাৎ বরেন্দ্র দেবরাজের আশির্বাদপুষ্ট দেশ। বহু শতাব্দীর পুরাতন জনপদ বরেন্দ্র অঞ্চল। প্রায় ৬০ কোটি বছর আগেকার আর্কিয়ান যুগে এ অঞ্চলের গোড়াপত্তন হয়েছিল। মধ্যযুগে বলা হতো 'বরিন্দ্র'। ফারসীতে 'বরিন্দ' এবং 'বুলন্দ' মানে উঁচু। বরেন্দ্র অঞ্চল ২৩°-৪৮'' উত্তর অক্ষাংশ, ৮৮°-০২'' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ও ৮৯°-৫৭'' পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। বরেন্দ্র অঞ্চলকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়-

সমতল বরেন্দ্র- এ এলাকা ৬,৬০০ বর্গ কি.মি. জুড়ে বিস্তৃত। সমতল বরেন্দ্র অপেক্ষাকৃত সমতল এবং কোথাও কোথাও অপ্রশস্ত ঢালু উপত্যকা। বরেন্দ্র অঞ্চলের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ সমতল বরেন্দ্র অঞ্চলভুক্ত।

প্রশস্ত খণ্ডিত বরেন্দ্র- প্রায় ৯০০ বর্গ কি.মি. এলাকা নিয়ে গঠিত। এ এলাকা প্রায় সমতল এবং কিছু উপত্যকা দ্বারা খণ্ডিত এবং বিভক্ত।

সংকীর্ণ খণ্ডিত বরেন্দ্র- বরেন্দ্র অঞ্চলের পশ্চিমাংশে প্রায় ৮০০ বর্গ কি.মি নিয়ে এ এলাকা গঠিত। গভীর উপত্যকা ও খাড়ি দ্বারা বিভক্ত, উঁচু, ঢালু ও সমতল সমন্বয়ে গঠিত টেরাসকৃত ভূমি।

বরেন্দ্র ভূমি আমাদের দেশের অন্য সব অঞ্চল থেকে অপেক্ষাকৃত উঁচু। সাধারণভাবে বর্ষাকালে এ অঞ্চল প্লাবিত হয় না। বরেন্দ্র অঞ্চলের ভূমির গঠন নিয়ে বেশ বির্তক রয়েছে। তবে অনেকের মতে প্রায় ১৮ লক্ষ বছর আগে প্লিস্টোসিন যুগ থেকে হলোসিন যুগ পর্যন্ত ভূ-গাঠনিক আন্দোলনজনিত কারণে উদ্বেলিত হওয়ায় এ অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। ষাটের দশকে ভারতের পাশ্চিমাংশের জঙ্গীপুরে পদ্মা নদীতে গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণ করা হয়। এর ফলে বরেন্দ্র অঞ্চলে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। শুরু হয় মরুকরণ প্রক্রিয়া। আবহাওয়াবিদগণ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, বরেন্দ্র অঞ্চল ক্রমান্বয়ে মরুভূমিতে পরিণত হবে। মরুকরণের কবল থেকে এ অঞ্চলকে বাঁচানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ ও প্রকৌশলীগণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠনের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই এ ক্ষেত্রে সুফল পেতে শুরু করেছে।

বরেন্দ্র অঞ্চলের আবহাওয়া

বরেন্দ্র অঞ্চলের জলবায়ু সর্বাপেক্ষা শুষ্ক এবং চরম ভাবাপন্ন। দেশের অন্য সকল অঞ্চলের চেয়ে বরেন্দ্র অঞ্চলে বৃষ্টিপাত খুবই কম। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত অসমান, তারতম্য অত্যন্ত বেশি। বরেন্দ্র অঞ্চলের যেমন বেশি উত্তপ্ত দিনের সংখ্যা (৪০° সে. বা তার উপর) তেমনি ঠাণ্ডা দিনের সংখ্যাও বেশি (৮° সে. বা তার নিচে)। মাছ চাষের জন্য খুব কম বা খুব বেশি তাপমাত্রা উপযোগী নয়। এ ক্ষেত্রে ২৫-৩৫° সে. তাপমাত্রা অনুকূল। তাপমাত্রা কমে গেলে মাছের বিপাকক্রিয়া হ্রাস পায়। সাধারণভাবে ১° সে. তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য মাছের বিপাকের হার ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। তাপমাত্রা কমতে থাকলে মাছের খাওয়ার হারও কমে। শীতকালে আমাদের দেশে মাছ খুব কম বাড়ে এবং কম খায়, বরেন্দ্র অঞ্চলে যেহেতু শীত এবং গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রার ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, সে জন্য বরেন্দ্র অঞ্চলের জলাশয়ে মৌসুমী মাছ চাষ অনেকাংশে লাভজনক হতে পারে।

বরেন্দ্র অঞ্চলের মাটি ও পানি

বরেন্দ্র অঞ্চলের ভূ-আকৃতি উপর থেকে নিচ দিকে ক্রমশঃ ঢালু। বরেন্দ্র এলাকার মাটি হলো এঁটেল এবং ক্ষেত্র বিশেষে এঁটেল দোআঁশ। এই এলাকার মাটির বিশেষত্ব হল গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড শক্ত ও রসহীন থাকে, কিন্তু বর্ষাকালে কাদাযুক্ত হয়ে যায়। বিশেষ করে রাজশাহীর গোদাগাড়ী ও তানোর। চাঁপাই নবাবগঞ্জের গোমাস্তাপুর ও ভোলাহাট নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর, পোরশা, সাপাহার, পত্নীতলা, দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, হাকিমপুর, বিরামপুর, বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম, কাহালু, আদমদীঘি, জয়পুরহাট, পাঁচবিবি, ক্ষেতলাল, কালাই উপজেলার মৃত্তিকা খুবই এটেল ও কাদাযুক্ত। উপরের মাটির স্তর অগভীর। মাটির নিচের স্তর অত্যন্ত কঠিন এবং পানি অপ্রবেশ্য। মাটিতে জৈববস্তুর পরিমাণ অত্যন্ত কম (০.৮-০.৫০ ভাগ)। মাটির গঠন দুর্বল, অম্লভাবাপন্ন। বন্যামুক্ত এলাকা বিধায় বন্যাবাহিত পানি উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে না। অপ্রতুল গাছ ও বৃক্ষরাজি থাকায় বর্ষার পানি ঢালু বরেন্দ্র অঞ্চল থেকে গড়িয়ে নদীতে চলে যায়। এ অঞ্চলে মাটির পানি ধারণক্ষমতা খুবই কম। বরেন্দ্র অঞ্চলে কিছু কিছু লাল মাটি এলাকার মাটি অম্লীয় প্রকৃতির হয়। মাটির প্রায় নিরপেক্ষ অম্লমান। পিএইচ ৬.৫-৭.৫ মানে অধিকাংশ অত্যাবশক পুষ্টি উপাদান নির্গত হয়। আর এই পুষ্টি উপাদানগুলো পুকুরের ক্ষুদ্র উদ্ভিদ জন্মাতে তথা প্রাথমিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কম বা

ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। উদ্যোক্তা প্রকল্পের আওতাধীন উলেখসংখ্যক বেসরকারি উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক প্রথায় মাছ চাষের কলা-কৌশল শেখানো হয়েছে। দারিদ্র বিমোচন প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীন এবং প্রান্তিক চাষীদের দল গঠন করে সুদবিহীন ঋণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র মৎস্য চাষিদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির কার্যক্রম সফলভাবে এগিয়ে চলছে। উপজেলা পর্যায়ে মৎস্য সম্পসারণ প্রকল্পের স্থানীয় মৎস্য পরামর্শক সৃষ্টির প্রয়াসে ফলাফল প্রদর্শন এবং সাথী মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। বরেন্দ্র অঞ্চলে জবই বিল প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে গতিশীল করে তুলেছে। বিলের গভীর এলাকায় দু'টি মৎস্য অভয়াশ্রম গড়ে তোলা হয়েছে। মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে বলিষ্ট ভূমিকা রেখেছে। বৃদ্ধি পেয়েছে মাছের উৎপাদন। বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা কার্যালয় থেকে পরামর্শ গ্রহণে আগত চাষীদের পরামর্শ প্রদান চলছে। আঞ্চলিক রেডিও কেন্দ্র থেকে মৎস্যচাষ বিষয়ক কথিকা প্রচারে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। গত দু'বছর ধরে রাজশাহী সেনানিবাসে সেনা সৈন্যদের মাছ চাষের ওপর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। মৎস্যচাষ সম্প্রসারণে এটি নিঃসন্দেহে একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ।

সুপারিশ

- বরেন্দ্র অঞ্চলের জলাশয়গুলি মাটি ও পানির গুণাগুণ তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষার জন্য ভ্রাম্যমান ল্যাবরেটরির ব্যবস্থা করতে হবে।
- এ অঞ্চলের মাছ চাষে বিদ্যমান সমস্যা, যথা-পানির ঘোলাত্ব, অম্লত্ব দূরীকরণের সমাধানের লক্ষে পরিবেশ উপযোগী নতুন কলাকৌশল উদ্ভাবনপূর্বক মাছ চাষকে আরও তরান্বিত করতে হবে।
- এলাকাভিত্তিক পুকুরের মাটি ও পানির গুণাগুণ যথাসময়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেই অনুযায়ী মাছ চাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে।
- বরেন্দ্র অঞ্চলের পুকুর/জলাশয় হতে পানি সেচ দিয়ে ধানসহ অন্যান্য ফসল চাষ করা হয়। এ উদ্দেশ্য জলাশয়ের প্রকৃতি নষ্ট না করে মাছ চাষে পানি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- অত্র অঞ্চলে অধিকাংশ পুকুর-জলাশয় বহু মালিকানাধীন হওয়ায় মাচ চাষ হচ্ছে না। পুকুর উন্নয়ন আইন বাস্তবায়নপূর্বক ঐ সকল পুকুর মাছ চাষের আওতায় আনতে হবে।
- জলাশয়/পুকুর প্রকৃতি পরিবর্তন না করে অন্য কোন উদ্দেশ্যে জলাশয়/পুকুরগুলি পত্তনি দেয়া যাবে না।
- মানসম্পন্ন পোনা উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- বরেন্দ্র অঞ্চলের সরকারী/বেসরকারী হ্যাচারিসমূহে সুস্থ-সবল পোনা উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হ্যাচারি-নার্সারি মালিকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- অত্র অঞ্চলের নদীনালা, খাল-বিল পদ্মা ও উহার শাখা নদীর সাথে সংযুক্ত বিধায় বেড়িবাঁধ স্লুইস গেটসমূহে ফিসপাস-এর ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ পদ্মা নদীতে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ঘটে।
- প্রাকৃতিক মৎস্য সম্পদের উৎপাদন একটি সহনশীল পার্যায়ে রাখার জন্য প্রাকৃতিক উৎস থেকে রেণু পোনা আহরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে।
- পুকুর পাড়ে পাতাবহুল গাছ লাগানোর পরিবর্তে তাল, নারিকেল, সুপারি, পেপে অথবা ইপিল-ইপিল গাছ লাগাতে হবে।
- সম্পূরক খাদ্য নিয়মমাফিক দিতে হবে।

উপসংহার

মানুষের জীবনধারণের জন্য আমিষের বিশেষ প্রয়োজন এবং বাংলাদেশে প্রাণীজ আমিষের শতকরা ৬৩% আসে মাছ ও মৎস্যজাত উৎস থেকে। তাই পুকুর-খাল-বিল, সর্বোপরি জলাশয়ের প্রতিটি অংশে মাছ চাষ করা একান্ত জরুরী। বরেন্দ্র এলাকায় যেহেতু প্রচুর পতিত পুকুর আছে এবং এই পুকুরের বিরাট অংশ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে, তাই এই সব পুকুর-দীঘি সংস্কার করে আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষ করলে একদিকে যেমন এই বৃত্তের জনগোষ্ঠীর আমিষের অভাব পূরণ হবে অপরদিকে অর্থনৈতিকভাবে দেশ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে। বিশেষতঃ শস্য ভান্ডর হিসাবে পরিচিত বরেন্দ্র এলাকাকে উন্নত মাছ চাষের আওতায় এনে মৎস্য ভাণ্ডার হিসেবে পরিণত করা সম্ভব। সুখের বিষয় এই যে, মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে বরেন্দ্র এলাকায় জনসাধারণ আস্তে আস্তে মাছ চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছে। সেদিন আর বেশি দূরে নয় যেদিন বরেন্দ্র এলাকার মানুষও মাছে-ভাতে পরম সুখের জীবনযাপন করবে।

জাল) পরিচালনাকে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখা এবং জালের ফাঁস নিয়ন্ত্রন করা। অন্যদিকে ট্রলার সহযোগে মৎস্য শিকারীদের প্রজনন মৌসুমে (মধ্য নভেম্বর-মধ্য ফেব্রুয়ারি) সমুদ্রে মৎস্য শিকার থেকে বিরত রাখা।

৩। মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থা

১৯৮৩ সালে প্রনীত সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশে কতিপয় আইনের সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ থাকলেও তা কার্যকরী ভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। অধ্যাদেশের সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় ইতোমধ্যে অনেক দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। এরমধ্যে অনেক প্রয়োজনীয় ধারা/বিধির সন্নিবেশ করা প্রয়োজন যা ছাড়া মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বস্তুত অকার্যকর। তাই অধ্যাদেশের পূর্ণপর্যালোচনা পূর্বক তার যুগোপযোগী পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করা প্রয়োজন। তবে এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন হবে বিজ্ঞান ভিত্তিক ও পরিসংখ্যানগত নানা ধরনের তথ্য যার যোগান আসবে জরীপ ও অনুসন্ধানমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে অবিলম্বে এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম হাতে নেয়া দরকার।

অন্য একটি প্রধান সমস্যা হচ্ছে, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের অবস্থানগত অসুবিধা ও অপর্যাপ্ত জনবল। কেবলমাত্র চট্টগ্রামে স্বল্প সংখ্যক জনবল নিয়ে অবস্থিত থেকে এই বিশাল উপকুলে পরিচালিত যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের লাইসেন্সিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছে না সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর। সম্প্রতি একটি প্রকল্পের মাধ্যমে এ কার্যক্রমকে জোরদার করার চেষ্টা করে আংশিকভাবে সফল হওয়া সম্ভব হয়েছে। এ কাজে অপর প্রধান সমস্যা হচ্ছে নৌ-বাণিজ্য অধিদপ্তর হতে মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশনের বাধ্যবাধকতা। এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত সংস্থার জনবলও অত্যন্ত সীমিত এবং এর কার্য্যালয় কেবল চট্টগ্রাম ও খুলনায় অবস্থিত। পাশাপাশি বর্তমানে বিরাজমান ব্যবস্থাপনায় উপকূলীয় জেলাসমূহের জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণের সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজের জন্য দায়বদ্ধতা না থাকা, এমনকি তাদের নিকট দায়িত্বও সেভাবে হস্তান্তরিত না হওয়া আর একটি প্রধান সমস্যা।

সকল যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযানকে অধ্যাদেশের আওতায় আনার জন্য লাইসেন্সিং কার্যক্রম সমগ্র উপকুলে বাস্তবায়ন করতে হলে উপকূলীয় জেলার সকল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও উপজেলা/থানা মৎস্য কর্মকর্তাগণকে সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার সমগ্র পর্যায়ে সম্পৃক্ত করা একান্ত অপরিহার্য্য। অন্যথায় সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের স্বল্প জনবল দ্বারা কেবলমাত্র চট্টগ্রামে অবস্থিত থেকে সমগ্র উপকুলের মৎস্য সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা করা একেবারেই অসম্ভব। আলোচ্য সকল বিষয়ে যুগপৎ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক কার্যকরী কর্মসূচী প্রণয়ন ও সম্প্রসারণ করতে হলে সামুদ্রিক মৎস্য উইং এর জনবল ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন।

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য নৌযানের অসম্পূর্ন ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি নিলামের মাধ্যমে বিক্রিত, নৌবাহিনী কর্তৃক আটককৃত, বিদেশী অবৈধ মৎস্য শিকারী ট্রলার মহামান্য আদালতের নির্দেশে সাময়িক মৎস্য শিকারের আদেশপ্রাপ্ত হচ্ছে, ফলে ট্রলারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অব্যহতভাবে মৎস্য আহরন করে চলেছে। পরিনামে ফিশিং ইফোর্ট উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মৎস্য মজুদের জন্য তা হুমকি হয়ে দাড়িয়েছে। এ অবস্থার একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান প্রয়োজন।

এ সমস্ত বিষয়গুলি যথাযথ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ক্রমান্বয়ে নিঃশেষ পর্যায়ে উপনীত হবে। এ মূল্যবান সম্পদ হতে আমিষের চাহিদার যোগান পেতে এবং বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থা থেকে উত্তরনের জন্য মৎস্য সম্পদের মজুদকে দীর্ঘমেয়াদীভাবে সহনশীল পর্যায়ে উন্নীত করা প্রয়োজন। এ জন্য আর কাল বিলম্ব না করে বিজ্ঞান ভিত্তিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া চালু করা প্রয়োজন। এমনভাবে মৎস্য সম্পদ আহরণ করা দরকার যাতে মৎস্য মজুদ স্থিতিশীল পর্যায়ে থাকে এবং মৎস্যজীবিগণ তাদের শ্রমের সঠিক মূল্য পায় এবং তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটে।

উপকূলীয়/সামুদ্রিক ক্ষুদ্র মৎস্যজীবিদেরকে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সকল ক্ষতিকর জাল ব্যবহার রোধ, যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের লাইসেন্সিং এর মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, উপকূলীয় পরিবেশ দূষন রোধ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং সাগরের মৎস্য সম্পদের সহনশীল আহরণ-সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা এই মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরী। প্রশিক্ষনের মাধ্যমে উপকূলীয় মৎস্যজীবিদের সচেতনতা বৃদ্ধিসহ মৎস্য আহরণে সঠিকভাবে নির্দেশনা প্রদান করতে পারলে সাগরে মৎস্য সম্পদের মজুদ বৃদ্ধি পাবে, জেলেরা সহনশীল ভাবে মৎস্য আহরণ করে তাদের আর্থিক অবস্থার কাঙ্খিত উন্নয়ন ঘটাতে পারবে এবং দেশে আমিষের ঘাটতিও পূরন হবে বলে বিশেষজ্ঞগন আশা করেন।

বর্তমানে সরকার কর্তৃক চিংড়ি পোনা আহরন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু নানাবিধ আর্থসামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারনে তা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। সম্প্রতি কক্সবাজার জেলাতে ইউ.এন.ডি.পি.-এর আর্থিক এবং এফ.এ.ও.-এর কারিগরী সহযোগীতায় সীমিত পরিসরে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য শিল্পের ব্যবস্থাপনা শীর্ষক

৫। আন্তর্জাতিক মৎস্য আহরন আচরণবিধি ঃ

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) ৩১শে অক্টোবর, ১৯৯৫ তারিখে দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণের আন্ত জাতিকভাবে গৃহীত আচরণ বিধি (Code of Conduct for Responsible Fisheries) জারী করে। তাতে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করার মাধ্যমে এই আচরনবিধি পালনের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে। এতে দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণের অনেক খুটিনাটি বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। সেই আলোকে এদেশের অগভীর সামুদ্রিক অঞ্চলে মৎস্য আহরণের জন্য উপরোক্ত নীতিমালা সমূহের মধ্যে যেগুলোকে সর্বাগ্রে গুরুত্বসহকারে বাস্তবায়ন করা দরকার তার সার-সংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

(১) মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে (প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত/ অর্থনৈতিক/ সামাজিক নিয়ামকসমূহকে গুরুত্ব দিয়ে) মৎস্য মজুদের সহনশীল আহরণ বজায় রাখার জন্য পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসহ যথাযথ কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে।

(২) জীব-বৈচিত্র বজায় রাখা, প্রজাতিগত কাঠামো সংরক্ষণ করা, জলজ পরিবেশ সংরক্ষণ করা এবং আহরিত মৎস্যের মান সংরক্ষনের জন্য পরিবেশ বান্ধব মৎস্য আহরণ সামগ্রী/পদ্ধতি সমূহের ব্যবহার বাড়িয়ে আরও উন্নত এবং প্রায়োগিকভাবে মৎস্য আহরণ করতে হবে।

(৩) দায়িত্বশীল মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সহনশীলতার প্রয়োজনে মৎস্য আহরনকারীগনকে পরিবেশবান্ধব আহরন পদ্ধতি উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগীতা করতে হবে।

(৪) সকল সংবেদনশীল মৎস্য আবাসস্থল সমূহ যেমন- উন্মুক্ত জলাশয়, ম্যানগ্রোভ/প্যারাবন, কোরাল-রিফ, লেগুন এবং অন্যান্য প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র সমূহকে সবরকম ক্ষতিকর কর্মকান্ড থেকে রক্ষা করে সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনে পূনর্বাসন করতে হবে।

(৫) প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করে মৎস্য সম্পদের সংরক্ষন ও দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনায় মৎস্য-জীবিদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে হবে।

(৬) বেকারত্ব দূরীকরণ, কর্মসংস্থান এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য মৎস্য সম্পদের উপর মৎস্য জীবিদের অধিকার যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

(৭) মৎস্য সম্পদের অতি আহরন এবং অতিরিক্ত আহরণ-ক্ষমতা (ফিশিং ক্যাপাসিটি) পরিহার করতে হবে যাতে আহরণ-ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট মৎস্য উৎপাদন ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন হয় এবং মৎস্য মজুদের ব্যবহার অর্থনৈতিক ভাবে লাভজনক হয়। সেই সাথে নিঃশেষিত মৎস্য মজুদসমূহকে পুনর্বাসন ও পুনউৎপাদনের সুযোগ দিতে হবে।

৬। বাস্তবায়ণযোগ্য ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ঃ

উপরোল্লেখিত আচরনবিধি অনুসরন করতে হলে যে সকল কার্যক্রম হাতে নেয়া প্রয়োজন, তা হলো ঃ

(১) মৎস্য আহরনের ভৌগলিক ও ঋতুভিত্তিক মাত্রা ও তার প্রভাব নির্ধারন।

(২) বিকল্প পেশা/ কর্মসংস্থানের সুযোগ চিহ্নিতকরন ও ক্ষুদ্র ঋণ/অফেরতযোগ্য সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মৎস্যজীবিদের পুনর্বাসন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন।

(৩) অগভীর উপকূলীয় অঞ্চলে আংশিক/সম্পূর্ন অনাহরিত মৎস্য ও অন্যান্য সম্পদের বিস্তৃতি নিরূপণ এবং আধুনিক/পরিবেশ বান্ধব আহরন পদ্ধতি চিহ্নিত করে তা সম্প্রসারনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র জেলেদের আংশিক পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার সূচনা করা।

(৪) উপকূলীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক মাছ চাষ, কাঁকড়া চাষ, ঝিনুক চাষ ও অন্যান্য প্রাণির চাষ প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারন। উদ্ভাবিত প্রযুক্তির সম্প্রসারনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা।

(৫) বর্তমানে উন্নয়াধীন বৃহদাকৃতির উপকূলীয় চিংড়িঘের/ খামার সমূহে ক্ষুদ্রকৃতির মৎস্যজীবি ও প্রান্তিক গরীব চাষীদের সম্পৃক্ত করে সমাজভিত্তিক অংশীদারিত্বমূলক সমুদ্রিক মাছ ও চিংড়ি চাষ কৌশল গ্রহণ করা।

(৬) মৎস্য সেক্টরের বাহিরে অন্য বিকল্প পেশায় ক্ষুদ্র জেলেদের পুনর্বাসন করা।

(৭) মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও আইন পালন সম্পর্কিত উদ্বুদ্ধকরন ও প্রচারনামূলক সম্প্রসারণমূলক কার্য্যক্রম পরিচালনা করা এবং মৎস্য ব্যবস্থাপনায় মৎস্যজীবিদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা।

(৮) জাল/নৌকার শ্রেণি বিন্যাস করন এবং তা সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশের আওতায় আনায়ন কাজ জোরদারকরন।

(৯) উপকূলীয় জেলা সমূহের জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের কাছে ক্ষমতা বিকেন্দ্রী করনের মাধ্যমে আর্টিস্যানাল মৎস্য নৌযানের লাইসেন্সিং সহ সকল সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্য্যক্রমে তাদের সরাসরি অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা।

৭। উপসংহার ঃ

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সামুদ্রিক মাছের যোগান নিশ্চিত করতে হলে দায়িত্বশীল মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও আহরণ প্রক্রিয়ার সুচনা করা প্রয়োজন। তাই সমগ্র উপকূলে সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা, সার্ভেইল্যান্স এবং লাইসেন্সিং কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের জনবল বৃদ্ধি সহ বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। আমাদের সচেতন হবার সময় হয়েছে। আর বিলম্ব না করে এখনই কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

সারণী-১: বাংলাদেশে মৎস্য উন্নয়নে জেনেটিক ও বায়োটেকনোলজিক্যাল প্রযুক্তির ব্যবহার।

প্রযুক্তি	যেসব মাছের প্রজাতির উপর প্রয়োগ করা হয়েছে	মৎস্য উন্নয়নে প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য
লিঙ্গান্তর (জনঃ reversal) পদ্ধতি	গিফট তেলাপিয়া, রাজপুঁটি ও শিং মাছ	এসব মাছের এক লিঙ্গ জাতের মধ্যে গিফট তেলাপিয়ার পুরুষ জাতের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।
এ্যালোজাইম মার্কার	ইলিশ	এ্যালোজাইম মার্কার ব্যবহার করে বাংলাদেশে ইলিশ মাছের একক ষ্টক সনাক্তকরণ সম্ভব হয়েছে।
DNA microsattelite মার্কার	বিগ হেড কার্প, সিলভার কার্প ও তাদের হাইব্রিড	হ্যাচারীতে বিশুদ্ধ বিগহেড কার্প, সিলভার কার্প ও তাদের হাইব্রিড জাত সনাক্তকরণ সম্ভব হয়েছে।
ক্রোমজম ইঞ্জিনিয়ারিং	রুই, মৃগেল, রাজপুঁটি, হাইব্রিড মাগুর ও শিংমাছ	মাগুর, রুই ও মৃগেল মাছে গাইনোজেনেটিক ও ট্রিপলয়েড জাত এবং রুই মাছের ক্লোন জাত উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে।
নির্বাচিত প্রজনন (Selective breeding)	গিফট তেলাপিয়া, রাজপুঁটি, রুই ও কাতল	এই পদ্ধতিতে আউছঐ ঝভরতসভত এবং আউছঐ ছতমসয়শঢ়ভ জাতের ২টি দ্রুত বর্ধনশীল মাছ উৎপাদন করা হয়েছে।
ক্রস ব্রিডিং	দেশী ও বিদেশী মাগুর, দেশী ও বিদেশী পুঁটি	সংকর মাগুর ও সংকর পুঁটি উৎপাদন করা হয়েছে। সংকর মাগুর এনঢ়নক্ষযড়ভড় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হয়েছে।
In Vitro fertilization	পাবদা, গুলশা, রুই, শিং, মাগুর, বাটা, রেবা, গনিয়া, কালবাউশ, শোল, গুজি, বেদা ও মহাশোল	বিপন্ন প্রজাতির এইসব মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবনের ফলে পোনা উৎপাদন ও লাইভ জীন ব্যাংকে সংরক্ষণ নিশ্চিত হয়েছে।
টিস্যু গ্রাফটিং	মিঠা পানির ঝিনুক	টিস্যু গ্রাফটিং পদ্ধতিতে একটি ঝিনুকের টিস্যু অন্য একটি ঝিনুকে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে মুক্তা উৎপাদন নিশ্চিত হয়েছে।

৩। বায়োটেকনোলজি গবেষণা ও উন্নয়নে ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা:

বাংলাদেশে অতি উন্নত এইসব প্রযুক্তি ব্যবহার ও প্রয়োগের মাধ্যমে বাণিজ্যিক গুরুত্ব সম্পন্ন মাছসমূহের উন্নত জাত উদ্ভাবন সম্ভব হলে বর্তমানে হ্যাচারীতে অন্ত:প্রজননসহ মাছের কৌলিতাত্বিক অবক্ষয়তা রোধ করা যাবে। অন্যদিকে উন্নত জাত চাষের ক্ষেত্রে স্বল্প সময়ে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করবে। তাছাড়া বন্যজাতের ষ্টক এসেসম্যাট, রোগ বালাই দমন ও সঠিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় বায়োটেকনোলজিক্যাল প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। তাই ভবিষ্যতে যে সব বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা প্রয়োজন তার সংক্ষিপ্ত দিক নির্দেশনা নিম্নে প্রদত্ত হল:

- নির্বাচিত প্রজনন, জীন ট্রান্সফার ও নিউক্লিয়ার ট্রান্সপ্লানটেশন পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করে উন্নত বৈশিষ্টময় বাণিজ্যিক গুরুত্ব সম্পন্ন মাছের জাত উদ্ভাবন;
- জেনেটিক মেনিপুলেশন ও লিঙ্গান্তর পদ্ধতির সমন্বয়ে পরিবেশবান্ধব একলিঙ্গ মাছের জাত উদ্ভাবন;
- বিপন্ন প্রজাতির মাছসমূহের জীনপুল রক্ষনের জন্যে হিমায়িত জীন ব্যাংক (Cryogenic gene bank) প্রতিষ্ঠাকরণ;
- ইলিশের মত অন্যান্য বাণিজ্যিক গুরুত্ব সম্পন্ন মাছের বন্যজাতের অবস্থা নির্ণয়নের জন্যে Molecular genetic marker যেমন DNA fingerprinting, RAPD, RFLP, DNA microsattelite সহ অন্যান্য অত্যাধুনিক মার্কারের ব্যবহার ও প্রয়োগ গবেষণা পরিচালনা।

৪। বায়োটেকনোলজি গবেষণা পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় সহায়তার বিষয়:

ক) *গবেষণাগার ও যন্ত্রপাতি*

1. Thermal cycler (PCR machine)
2. DNA sequencer
3. DNA hydrolizer
4. Ultra centrifuge

সামুদ্রিক উপরিস্তরের মৎস্য সম্পদের বর্তমান অবস্থা ও গুরুত্ব

ডঃ মোঃ মমতাজ উদ্দিন

১. ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় অন্তর্ভূক্ত,১,৬৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা দেশের মূল ভূখন্ডের আয়তনের চেয়েও বড়। এ জলসীমায় আহরণযোগ্য চিংড়ি ও মৎস্য প্রজাতির সংখ্যা অনেক। এছাড়াও রয়েছে অনাহরিত বিপুল মৎস্য সম্পদ। এসব মৎস্য সম্পদের মাঝে সমুদ্রের উপরিস্তরের মৎস্য সম্পদ অন্যতম। অদ্যবধি সমুদ্রের তলদেশের চিংড়ি ও মৎস্য সম্পদগুলোই কেবলমাত্র আহরিত হচ্ছে। আহরণযোগ্য ও অনাহরিত উপরিস্তরের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সঠিক জরিপ ও গবেষণার মাধ্যমে উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা গেলে এ খাত থেকে দেশের বিদ্যমান প্রোটিন চাহিদার সিংহভাগ পূরণ করেও অতিরিক্ত সম্পদ বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

২. সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ঃ

দেশের বিস্তৃত সামুদ্রিক এলাকা নানাবিধ মৎস্য সম্পদে খুবই সমৃদ্ধশালী। এসব মৎস্য সম্পদের মাঝে রয়েছে ৪৭৫ প্রজাতির মাছ, ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি, ৫ প্রজাতির লবষ্টার, ৯৫ প্রজাতির কাঁকড়া, ৯২ প্রজাতির শিরোপদী প্রাণী, ৬ প্রজাতির কস্তুরা, ৩০০ প্রজাতির ঝিনুক ও শামুক, ৩৩ প্রজাতির সাগর কুসুম, ১১ প্রজাতির তিমি ও ডলফিন, ২ প্রজাতির তারা মাছ, ৩ প্রজাতির স্পঞ্জ, ৫ প্রজাতির কচ্ছপ, ৫৬ প্রজাতির শৈবাল, ১৩ প্রজাতির প্রবাল এবং সাগর শসা, সাগর সজারু, কুমির ইত্যাদি।

৩. উপরিস্তরের (পেলাজিক) মাছের মজুদ ঃ

সামুদ্রিক মৎস্য ও চিংড়ি সম্পদের মজুদের পরিমাণ ও সর্বোচ্চ আহরণ মাত্রা নির্ধারণের লক্ষ্যে বিচ্ছিন্নভাবে গৃহীত অনুসন্ধানী কার্যক্রমের ফলে তলদেশী মাছ ও চিংড়ি সম্পদের মজুদ সম্বন্ধে কিছুটা তথ্য পাওয়া গেলেও উপরিস্তরে বিরাজমান মৎস্য সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য তেমন কোন জরিপ কার্যক্রম অদ্যবধি পরিচালিত হয়নি। বিগত ১৯৭৯ ইং সালে ডঃ ফ্রিডজুফ নানসেন জাহাজের মাধ্যমে পরিচালিত জরিপকালে তলদেশী মাছ ও চিংড়ি মজুদ নির্ণয়ের পাশাপাশি সাগরের উপরিস্তরের মৎস্য সম্পদের পরিমাণ ৬০,০০০-১২০,০০০ মেট্রিক টন নির্ধারণ করা হয়। তবে এক্ষেত্রে ব্যবহৃত পদ্ধতির ব্যবহারিক সীমাবদ্ধতার কারণে এ পরিমাণকে অত্যন্ত কম বলে মনে করা হয়। তাছাড়া বাংলাদেশ-থাইল্যান্ডের যৌথ জরিপ কালেও টুনা ও টুনা জাতীয় মাছ এবং হাঙ্গরের প্রাচুর্যতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। এতদ্ব্যতীত গভীর ও অগভীর সামুদ্রিক এলাকায় চিংড়ি ও মৎস্য আহরণ কালেও টুনা, ম্যাকরেল, সারডিন, হাঙ্গর ও অন্যান্য উপরিস্তরের মৎস্য সম্পদের প্রাচুর্যতা লক্ষ্য করা যায়।

৪. উপরিস্তরের মৎস্য সম্পদের পরিচিতি

সাধারণত উপরিস্তরের মাছ বলতে সামুদ্রিক মাছের মধ্যে যারা সমুদ্রের উপরের স্তরে থাকে এবং সেখানেই তাদের জৈবিক কার্যক্রম সম্পন্ন করে তাদেরকে বুঝানো হয়। এসব মাছের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এরা সর্বদাই দলবদ্ধভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়ায় এবং তাদের চলাফেরা কখনও এক জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে না। এরা দূর দুরান্ত এলাকা পর্যন্ত অভিপ্রয়ান করে বিধায় এদেরকে অভিপ্রয়ানকারী মাছও বলা হয়। কোন দেশের উপরিস্তরের মাছ তাদের অবস্থানের উপর নির্ভর করে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। যেমনঃ

- কিছু মাছ নিজস্ব একান্ত অর্থনৈতিক এলাকায় ঘুরে বেড়ায় বিধায় সেগুলো সংশ্লিষ্ট দেশের এখতিয়ারভুক্ত থাকে।
- কিছু মাছ নিজস্ব একান্ত অর্থনৈতিক এলাকার বাইরে এবং ভিতরে যাওয়া আসা করে। ফলে এরা সংশ্লিষ্ট দেশের এবং আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় থাকে।
- কিছু মাছ বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে কোন দেশের একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা অতিক্রম করে মহাসমুদ্রে ঘুরে বেড়ায়। ফলে এগুলি সাধারণত আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় আহরণ করা হয়।

মাছের আকার ও আকৃতি অনুযায়ী উপরিস্তরের মাছ দুধরনের হয়ে থাকেঃ

- উপরিস্তরের ছোট মাছ যেমন-এনচ্যাভি, সারডিন, ইলিশ , পমফ্রেট ইত্যাদি।
- উপরিস্তরের বড় মাছ যেমন-টুনা, ম্যাকারেল, হাঙ্গর এবং স্ক্যাড ইত্যাদি।

৫. বাণিজ্যিকভাবে আহরিত উপরিস্তরের মাছ ঃ

বাংলাদেশের সামুদ্রিক এলাকায় যে সমস্ত উপরিস্তরের মাছ পাওয়া যায় তার মাঝে ক্ষুদ্রাকার কিছু কিছু মাছ ট্রলার এবং যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের মাধ্যমে ফাঁশ জাল দ্বারা প্রচুর

সরণী-১ ঃ টুনা ও টুনা জাতীয় মাছের উৎপাদন ঃ

দেশ	আহরণের পরিমাণ (টন)
ভারত	৬০,২৪৭ - ১১৯৪৭৫
ইন্দোনেশিয়া	৮৯০০৫ - ১০৩৫৪০
শ্রীলংকা	৯৪৬৯ - ৮৯৫৯৮
মালদ্বীপ	৫৪৩৬৮ - ৮৯৫৯৮
মালয়েশিয়া	৬২৪৭ - ১৪৩৪৬
থাইল্যান্ড	৫৭২৯ - ১৭১০৫
বাংলাদেশ	১৬ - ৯৫
সূত্র ঃ Indian Ocean Tuna Fisheries Data Summary for 1984-94	

প্রতিবেশী দেশ ফিলিপাইনেও উপরিস্তরের মৎস্য সম্পদ ব্যাপকভাবে আহরণ করা হয়ে থাকে। ১৯৮০ সালের পরিসংখ্যান মোতাবেক ফিলিপাইনের মোট সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনের শতকরা ৬২ ভাগ আহরিত হয়েছিল উপরিস্তরের মৎস্য সম্পদ থেকে। তাছাড়া এসব উপরিস্তরের মাছের মধ্যে শতকরা ৫৫ ভাগ পাওয়া গেছে গভীর সমুদ্র এলাকায় এবং শতকরা ৩০ ভাগ পাওয়া গেছে অগভীর অঞ্চল থেকে।

৯. উপরিস্তরের মৎস্য আহরণ পদ্ধতি ঃ

পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের সাহায্যে পার্স সেইন, গিল নেট, পোল এন্ড লাইন, লাইন এন্ড হুক, বেগ নেট প্রভৃতি পদ্ধতি দ্বারা উপরিস্তরের মৎস্য আহরিত হয়ে থাকে। তবে প্রধান পদ্ধতি তিনটিঃ পার্স সেইনিং, গিল নেটিং এবং লাইন এন্ড হুক। অতি সংক্ষিপ্তাকারে পদ্ধতিগুলো হল নিম্নরূপ ঃ

৯.১ পার্স সেইনিং ঃ উপরিস্তরের ছোট ও বড় মৎস্য আহরণের জন্য পার্স সেইনিং পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পার্স সেইন বেশ বড় ধরনের জাল যা এক কিলোমিটারের অধিক দীর্ঘ হয় এবং গভীরতা পরিচালনা ক্ষেত্রের উপর নির্ভলশীল হয়ে থাকে। বড় বড় মৎস্য নৌযানের সাহায্যে এসব জাল ব্যবহার করে বড় আকারের টুনা ও টুনা জাতীয় মাছ আহরণ করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় একটি বড় নৌযান এবং একটি ছোট নৌযান (স্কীপ বোট) ব্যবহার করা হয়। ছোট মাছ আহরণের জন্য উপকূলীয় এলাকায় ছোট পার্স সেইনার ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে কোন মাছের ঝাঁকের সন্ধান পাওয়া গেলে বড় জাহাজটিকে মাছের ঝাঁক থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা হয়। ছোট নৌযানটি জাল টেনে নিয়ে দ্রুত মাছের ঝাঁক ঘেরাও করে ফেলে। অতঃপর জালটি ধীরে ধীরে উপরে তোলা হয়। উপরিস্তরের বড় মাছের মধ্যে টুনা, বিল ফিস, সেইল ফিস ধরার কাজে পার্স সেইনার সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

৯.২ গীল নেটিংঃ উপরিস্তরের মাছ আহরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের গীল নেট ব্যবহার করা হয়। এদের মধ্যে সারডিন গীল নেট ও এনসার্কেলিং গীল নেট অন্যতম। সারডিন ধরার জালে ভিনাইল ২০,২ এস/৪ প্লাই অথবা নাইলেন ২১০ডি/৪ প্লাই সুতা ব্যবহার করা হয়। এসব জালের ফাঁস ৪.৩-৪.৫ সেঃমিঃ। মূল জালটি কয়েকটি ইউনিটে বিভক্ত থাকে। প্রতিটি ইউনিটের দৈর্ঘ ৫০-৭৫ মিটার। এসব জাল ৬০-১০০ মিটার গভীরতায় ব্যবহৃত হয়। ২০ টন ওজনের একটি নৌযান ৪০টি ইউনিট ব্যবহার করতে পারে। এসব জাল স্রোতের টানে ভেসে যায়। জাল ছড়াতে আধা ঘন্টা এবং তুলতে প্রায় দুই ঘন্টা সময় লাগে। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তিনজন জেলে এসব জাল পানিতে ফেলা ও পানি থেকে তুলতে পারে।

৯.৩. এনসার্কলিং গীল নেট ঃ একটি মাছের ঝাঁক দেখা গেলে জালটি এমনভাবে সেট করা হয় যাতে সমস্ত ঝাঁকটি ঘিরে ফেলা যায়। পরে পানিতে লাঠি দ্বারা পিটিয়ে অথবা বৈদ্যুতিক ঝলকানি ব্যবহার করে মাছগুলিকে ভীত সন্ত্রস্থ করে জালের দিকে তাড়িয়ে নেয়া হয়। অতঃপর ধীরে ধীরে জালটি পানির উপরে উঠিয়ে নেয়া হয়। এটা সাধারনতঃ ম্যাকারেল ধরার কাজে ব্যবহার করা যায়। মাছের আকারের সাথে মিল রেখে জালের ফাঁস তৈরী করা হয়। এবং জালের গভীরতা নির্ভর করে মাছের বিচরণ এলাকার গভীরতার উপর। তবে সারফেস গীলনেটের গভীরতা বেশী হওয়াই উত্তম। নাইলন মালটিফিলামেন্ট ২১০ডি/৯ এবং ২১০ ডি/১২ দ্বারা জাল তৈরী করা হয় এবং এসব জালের ফাঁসের আকার থাকে ৪.০-৪.৫ সেঃমিঃ। জালগুলো সাধারনতঃ ৭-১৯ মিটার প্রশস্ত থাকে। তবে মোল্টে মাছ আহরণের জন্য ব্যবহৃত জালের প্রস্থ কিছুটা কম থাকে। এক্ষেত্রে মনোফিলামেন্টের জাল ব্যবহার করা হয়।

৯.৩. লাইন এন্ড হুকঃ উপরিস্তরের মৎস্য আহরণের লক্ষ্যে দুই ধরণের লং-লাইন ব্যবহৃত হয়। উপরিস্তরের লং-লাইন এবং মধ্য-উপরিস্তরের লং-লাইন। উপরিতলের লং লাইন সাধারনতঃ ২০ মিঃ গভীরতা পর্যন্ত এবং মধ্য-উপরিতলের লং-লাইন ৫০-১০০ মিটার গভীরতায় ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি লাইনের একটি মেইন লাইন ও ৫টি শাখা লাইন থাকে। এটাকে এক বাস্কেট বলা হয়। সাধারণত মাছের আকৃতির সাথে সম্পর্ক রেখে হুক তৈরি করা হয়। টুনা মাছের হুক বর্গাকৃতিক করা হয়। হুকগুলি বেশ শক্ত তৈরি করা হয় যাতে ২৫০ কেজি ওজনের টানেও তা সঠিক

মৎস্য সেক্টরে মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী

ডঃ মোঃ সাইফুদ্দিন শাহ্

বাংলাদেশের অর্থনীতির অতীব গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য সেক্টরের সঠিক এবং টেকসই উন্নয়নের নিমিত্ত এই সেক্টরের মানব সম্পদ উন্নয়নের সর্ব সম্মত একটি কর্মসূচী কি হতে পারে এ বিষয়ে কিছু বলা তেমন সহজ সাধ্য না হলেও এর প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব উপলব্ধি তেমন কঠিন নয়। আমাদের অর্থনীতির যে কোন সেক্টরের যত সম্পদ এবং সম্ভাবনার কথাই বলা হোক না কেন, এদেশের অগণিত মানব সংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করার মত এত অনায়াস-সাধ্য সম্ভাবনা আর কোন ক্ষেত্রেই নেই এবং মৎস্য সেক্টরের মানব সম্পদ উন্নয়নের বেলায়ও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

এ দেশের মৎস্য সম্পদের পরিসংখ্যান বিশদভাবে তুলে না ধরেও একথা অনায়াসে বলা যায় যে, এদেশের এক কালের প্রাচুর্যতায় ভরপুর মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ এবং টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হলে এ সেক্টরে জড়িত বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠি-শিক্ষক, গবেষক, বিজ্ঞানী, ব্যবস্থাপক, সম্প্রসারণকর্মী, মাঠকর্মী, মৎস্য চাষী, জেলে গোষ্ঠি-এদের জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা উন্নয়নের কোন বিকল্প থাকতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন একটি দীর্ঘ মেয়াদী, সুষ্ঠু কর্মসূচী।

মৎস্য প্রজাতি সংখ্যা এবং প্রাচুর্যতার বিচারে এ দেশের মৎস্য সম্পদ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম একটি বৃহৎ এবং বৈচিত্রময় প্রাকৃতিক সম্পদ। এ দেশে নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওড়, পুকুর-দীঘি এবং অন্যান্য জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৪৩ লক্ষ হেক্টর। এখানে চাষযোগ্য জলাভূমির পরিমাণ প্রায় ৫০ হাজার হেক্টর। দেশের দক্ষিণে মোহনা অঞ্চলে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার হেঃ এলাকায় চিংড়ি চাষ হচ্ছে। আমাদের গোটা দেশে বিস্তৃত বিভিন্ন প্রধান প্রধান নদী অববাহিকায় যে প্লাবনভূমি রয়েছে তার পরিমান প্রায় ৪০ লক্ষ হেঃ। এ দেশে রয়েছে প্রায় ২৩ লক্ষ হেঃ বিস্তৃত মোহনা অঞ্চল এবং ৭১০ মাইল দীর্ঘ সমুদ্র তট রেখা। এছাড়াও বঙ্গোপসাগরে রয়েছে ২০০ মাইল একান্ত অর্থনৈতিক জোন, যা এ দেশের মৎস্য সম্পদের প্রাচুর্যতা এবং সম্ভাবনাকে নিঃসন্দেহে বাড়িয়ে তুলেছে। এ বিপুল অভ্যন্তরীণ এবং সমুদ্র জলরাশিতে প্রায় ৭৯৫ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়।

বিগত বছর গুলোতে এ দেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় থেকে আহরিত মাছের পরিমাণ ওঠানামা করলেও ৯০ এর দশক থেকে এ সেক্টরে উৎপাদনের গতি মোটামুটি উর্ধমূখী রয়েছে। চাষ থেকে আহরিত মাছের পরিমাণও সাম্প্রতিক বছর গুলোতে ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ দেশে প্রায় ১৪ লক্ষ লোক জীবিকার জন্য সার্বক্ষণিকভাবে এবং প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ লোক খণ্ডকালীনভাবে মৎস্য সেক্টরের উপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশের মৎস্য সেক্টরকে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত সাব-সেক্টরে ভাগ করা যায়ঃ

ক) অভ্যন্তরীণ স্বাদু-পানির মাছ চাষ খাত,
খ) অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আহরণ খাত,
গ) লোনা পানিতে মৎস্য চাষ (চিংড়ি চাষ) খাত ও
ঘ) সামুদ্রিক মৎস্য খাত।

প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট নানা কারণে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়সমূহ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এ খাত থেকে উৎপাদিত মাছের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলা হলেও বাজার সরবরাহে পুকুরে চাষকৃত মাছ যত বেশি লক্ষ্য করা যায়, মুক্ত জলাশয়ের আহরিত মাছ তেমন দেখা যায় না। আর একথাও সত্যি যে, সাম্প্রতিকালে মাছ চাষের প্রযুক্তি যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয়েছে এবং যদিও পুকুরে বা বদ্ধ জলাশয়ে মাছের উৎপাদন হার আশানুরুপভাবে বৃদ্ধি হয়নি, তবে বাজারে মাছের সরবরাহ থেকে একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ইদানিংকালে দেশের মোট উৎপাদিত মাছে চাষ খাতের অবদান বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের দক্ষিণে মোহনা অঞ্চলের নিম্ন ভূমিতে লোনা পানিতে চিংড়ি মাছের চাষ প্রযুক্তি সাম্প্রতিককালে বিপুল প্রসার লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির মূল্য বৃদ্ধি এবং দেশীয় প্রযুক্তি বিস্তারের সাথে মোহনা অঞ্চলে এ চাষের ক্ষেত্র ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার হেক্টরে দাড়িয়েছে। চিংড়ি চাষ থেকে এ দেশ বছরে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। যা হোক, চিংড়ি চাষ ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের কারণে মোহনা অঞ্চলের পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে এবং এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে। এক্ষেত্রে তাই দরকার পড়েছে সুষ্ঠু নিয়ম ও নীতিমালা। সামুদ্রিক মৎস্যের ক্ষেত্রে ক্রমাগতভাবে প্রতিযোগিতামুলক আহরণ এবং ব্যবস্থাপনার অদূরদর্শীতার কারণে মৎস্য সম্পদের স্থিতি কমে এসেছে। এক্ষত্রেও টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সুষ্ঠু নিয়ম-

এসব স্তরের কর্মী, পেশাজীবিদের জন্য দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করতে হবে এবং প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু অবশ্যই সার্বিক ভাবে সহজ সরল রুপে প্রণীত হতে হবে এবং তা অবশ্যই স্থানীয় ভাষায় বা মাতৃ ভাষায় রচিত এবং পরিচালিত হতে হবে।

উচ্চতর স্তরের মাছ চাষী এবং সম্প্রসারণ কর্মীদেরকে পার্শ্ববর্তী দেশে/আন্তর্জাতিক আঞ্চলিক কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পাওে। এছাড়া একটি সুচিন্তিত ও সুনিবিড় প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে প্রশিক্ষক- প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থাও থাকা বাঞ্চনীয়। এর ফলে একটি বাস্তব ভিত্তিক, সুগঠিত এবং টেকসই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে উঠে। এ ব্যবস্থায় প্রবীন এবং অভিজ্ঞ মৎস্য চাষবিদ/মৎস্য পেশাজীবিগণ, জুনিয়র স্তরের টেকনিশিয়ান বা সে স্তরের সমতুল্য বিভিন্ন কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। এই নিমিত্তে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/একাডেমি মধ্য থেকেই প্রশিক্ষকদের একটি কোর গ্রুপ তৈরী করতে হবে এবং তা সম্ভব না হলে এ সব প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে বাইরের অর্থাৎ এ দেশেরই বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান কিংবা সংশ্লিষ্ট কোন সংস্থা থেকে প্রশিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। সাধারণ মৎস্যচাষী,মৎস্য আহরণকারী এবং মোটা মুটি ভাবে অভিজ্ঞ জেলেদেরকে দেশের অভ্যন্তরেই কোন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠাণের সন্নিকটে অবস্থিত কোন আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যেখানে সহজেই অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের সহায়তা নেয়া সম্ভব। এ রকমের প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য দেশের অভ্যন্তর প্রয়োজনীয় সংখ্যক অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক পাওয়া না গেলে অভিজ্ঞ দেশ থেকে প্রশিক্ষক সংগ্রহ করা যেতে পারে।

দেশে পরিচালিত প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট/একাডেমিতে নিয়োজিত বিভিন্ন ক্যাডারের প্রশিক্ষকদের কর্মস্পৃহা এবং উদ্যম বাড়ানোর জন্য যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দিপনা প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রশিক্ষক হিসাবে যারা নিয়োজিত থাকবেন তাদের চাকুরী মৎস্য বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তার ন্যায় অন্ত-বিভাগ বদলীযোগ্য হওয়া ঠিক নয়। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়োজিত জনবলকে দক্ষ, নিষ্ঠ এবং কার্যকর হিসাবে গড়ে তুলতে হলে ইনষ্টিটিউট/একাডেমি মধ্যেই তাদের পদোন্নতির ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং তাদের উৎসাহ এবং উদ্দীপনা ধরে রাখতে হলে এমনকি বিশেষ বেতন স্কেল বা বিশেষ বর্ধিত বেতনের ব্যবস্থাও করতে হবে।

মৎস্য সেক্টরের মানব সম্পদ সংখ্যায় আদৌ কম না হলেও গুণগত মানে এ সম্পদ তখনই শ্রেয় বিবেচিত হবে যখন এদেশের মৎস্য সম্পদের উৎপাদন ও সংরক্ষণ মান বাড়িয়ে জাতীয় জীবনে এর সম্ভাবনাকে আরো বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হবে। আশার কথা এই যে, গুরুত্বের দিক থেকে এ দেশের অর্থনীতির অন্যান্য যে কোন সেক্টরের চেয়ে মৎস্য সেক্টর আমাদের তথা সরকারের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এর উন্নয়নে বর্তমান সরকার সচেষ্ট। এ চিন্তা চেতনা বজায় থাকলে অবশ্যই এ সেক্টরের ব্যাপক উন্নয়ন ও বিপুল জনগোষ্টিকে কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনগোষ্টি হিসাবে গড়ে তোলা যাবে।

কাজে নিয়োজিত। সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জরীপ কাজে এদেরকে পুনরায় সংঘটিত করতে হবে।

মৎস্য চাষঃ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফার্ম ম্যানেজার, বাওর ম্যানেজার এবং ৬৪টি জেলা মৎস্য কর্মকর্তাসহ প্রায় ৫১০ জন প্রফেশনাল সদর দপ্তর, জেলা ও উপজেলাসহ মাঠ পর্যায়ে মৎস্যচাষ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমে জড়িত। অন্য কথায় মৎস্য অধিদপ্তরের মোট জনবলের শতকরা ৭০ ভাগ মৎস্য চাষ ও সম্প্রসারণ কাজে সরাসরি জড়িত।

চিংড়ি সেক্টরঃ চিংড়ি খাতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রায় ১৮১টি পদ রেভিনিউ বাজেটে স্থানান্তরের পর পদগুলি অকার্যকর হয়ে পড়ে আছে। কেন্দ্রীয় এবং মাঠ পর্যায়ে সিম্প্র সেক্টরে নিয়োজিত জনবলের কোন সামাজিক ও অর্থনৈতিক back ground নাই। ফলে চিংড়ি চাষে সামাজিক সমস্যাদি চিহ্নিত করা এবং চিংড়ি চাষ উন্নয়নে চাষীদের সমস্যা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। প্রতি ক্ষেত্রেই বিদেশী বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহন করতে হয়।

প্রশিক্ষণঃ আনুমানিক ৫০ জন প্রফেসনাল সদর দপ্তর ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কর্মরত। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে কোন নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নেই। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের প্রতি কেলেন্ডার বছরে ন্যুনপক্ষে ৮০জন মৎস্য চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের mandate দেয়া আছে। কিন্তু বাজেটের অভাবে এই কার্যক্রম বিঘ্নিত হচেছ। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকল্প ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে। সাভারে অবস্থিত মৎস্য একাডেমী একজন পরিচালকের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচেছ, তবে সদর দপ্তরে একজন উপ-পরিচালক সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয় করেন যা সংগত নহে।

মৎস্য মান নিয়ন্ত্রণঃ মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ শাখায় সর্বসাকুল্যে জনবল ৫৬। এর মধ্যে মাত্র ২৩ জন প্রফেশনাল। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় তিনটি ল্যাবরেটরী আছে এর মধ্যে চট্টগ্রাম ল্যাবরেটরীতে জনবল ও যন্ত্রপাতি পর্যাপ্ত। কিন্তু এখন পর্যন্ত মাননিয়ন্ত্রণ শাখার রপ্তানীযোগ্য মাছ ও চিংড়ির নমুনা এটমিক এনার্জি কমিশন, বিসিএসআইআর এর মাধ্যমে সম্পন্ন করে রপ্তানিকারকদের চাহিদা মেটাতে হয়। স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই চাঁদপুর ফিসারীজ টেশনলজিক্যাল ল্যাবরেটরীতে যে দক্ষ জনবল গড়ে ওঠে, তার সবাই প্রায় অবসর গ্রহন করেছে। ফলে বর্তমানে মাননিয়ন্ত্রণ শাখায় অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনশক্তির চরম অভাব দেখা দিয়েছে।

মৎস্য জরীপঃ এই শাখায় ৬১জন সার্ভে অফিসারসহ মোট ৮৭জন জনবল রয়েছে। আশির দশকে এফএও/ইউএনডিপি প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় মৎস্য অধিদপ্তরের জরীপ কার্যক্রম চালু হয় এবং জেলে গ্রাম, নৌকা ও মাছ আহরণ সরঞ্জামসহ বিভিন্ন জলাশয়ের পরিমাণ সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হয় এবং বছর ওয়ারী প্রজাতি ভিত্তিক মাছের উৎপাদন ও অন্যান্য তথ্য সংগৃহীত হয়। এই তথ্যের ভিত্তিতে মৎস্য সেক্টরের পরিকল্পনা, উৎপাদন টার্গেট ও কৌশল নির্ধারিত হত। প্রকল্পকালে প্রণীত Frame অবিলম্বে সময়োপযোগী করা এবং তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি পরিবর্তন করে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা এবং একটি নির্ভরযোগ্য ডেটা বেস তৈরি করা অত্যাবশ্যক।

৩. সেক্টরওয়ারী জনবলের সার সংক্ষেপঃ

মৎস্য অধিদপ্তরের সাবসেক্টরওয়ারী জনবলের সার সংক্ষেপ নিচে দেখান হল।

সাবসেক্টর/শাখা	পদ সংখ্যা		
	১ম শ্রেণি	সার্পোট স্টাফ	মোট
সামুদ্রিক শাখা	৩৫	১৫৭	১৯২
চিংড়ি (কেন্দ্রীয় সেলসহ)	২৫	১৬৯	১৯৪
সম্প্রসারণ	১১৬	৫৬৫	৬৮১
প্রশিক্ষণ	৩৫	১৭৭	২১২
মাননিয়ন্ত্রণ	২৪	৩২	৫৬
জরীপ	১১	৭৬	৮৭
বিভাগ	১৪	৩০	৪৪
জেলা	৬৪	৩৯৭	৪৬১
উপজেলা	৪৭১	১৮৪৫	২৩১৬
সদর দপ্তর (প্রশাসন, পরিকল্পনা, আইন প্রয়োগ, প্রকৌশল, হিসাব, মেরিন সেল, চিংড়ি সেল)	২৯	৮৪	১১৩
সর্বমোট শাখা/সেল	৮২৪	৩৫৩২	৪৩৫৬

গুরুত্বপূর্ণ সেহেতু এই শাখায় বিশেষজ্ঞ জনবল দ্বারা একটি ক্যাডার গঠন করা প্রয়োজন।

(৫) মৎস্য জরীপ শাখার কর্মকান্ডের দুর্বলতা এবং তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির পরিবর্তন এবং একটি নির্ভরযোগ্য ডেটা বেইস তৈরি করার প্রয়োজনীয়তার কথা আমি ইতিপূর্বে বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। তবে এই কর্মকান্ড সুষ্ঠ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহে নিয়োজিত করতে হবে। সদর দপ্তরের উচচ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দ্বারা এই কার্যক্রমের সুষ্ঠু মনিটরিং করতে হবে। বর্তমানে চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং কার্যক্রম জেলা পর্যায়ে স্থাপন করা হচেছ যার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য সদর দপ্তরের জরীপ শাখায় বিশ্লেষণের জন্য প্রেরণ সহজতর হবে। তবে, সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণ ও ডেটা বেইস তৈরির লক্ষ্যে জরীপ শাখায় নুনপক্ষে একজন সিস্টেম এনালিষ্ট, ২ জন প্রোগ্রামার, ২জন Maintenance Engineer এবং ২জন সহকারী প্রোগ্রামারের পদ সৃষ্টি করতে হবে এবং এই পদে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৬. মৎস্য বিষয়ক উচচ শিক্ষা যুগোপযোগীকরণ সম্পর্কে কিছু প্রস্তাব ঃ

জাতীয় মৎস্য নীতিমালার আলোকে উপরোক্ত বিষয়ে নিম্নেবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(১) প্রাথমিক পর্যায় হতে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান পাঠ্য বইতে মৎস্য বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সংযোজন করতে হবে। মৎস্য সম্প্রসারণ শাখার কর্মকর্তাগণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় একাজের সমন্বয় করবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মৎস্য শিক্ষার পাঠ্যসুচিতে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। এই পাঠ্যক্রমে মৎস্য অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, মৎস্য জনসংখ্যা গতিবিদ্যা, মৎস্য মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম, মাইক্রোবায়োলজি, একুয়াকালচার রেসিডিউ মনিটরিং এর ব্যবহারিক বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। এ ব্যাপারে মৎস্য অধিদপ্তর ও মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করবে এবং এই কাজের সমন্বয় সাধন করবে।

(৩) প্রয়োজন বোধে বিশ্ববিদ্যালয় ও মৎস্য বিষয়ক বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে বিশেষজ্ঞ বিনিময় প্রথা প্রচলন করতে হবে।

(৪) উচচ শিক্ষার জন্য বিদেশে অধ্যয়ন করতে হলেও সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে দেশের স্থানীয় সমস্যার উপর গবেষণা কার্যক্রমের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(৫) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মৌলিক মৎস্য বিষয়ক গবেষণা এবং প্রায়োগিক গবেষণা শিক্ষা কর্মসূচিতে গ্রহণ করতে হবে।

(৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সংস্থার সুযোগ সুবিধা অর্থাৎ পুকুর, মৎস্য খামার, হ্যাচারী, প্রসেসিং সেন্টার এবং ফিসিং টলারসমূহ ব্যবহারের সুযোগ দিতে হবে। এ বিষয়ে বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে একটি অংগীকার পত্র প্রণয়নের দায়িত্ব মন্ত্রণালয় গ্রহণ করবে।

(৭) বিদেশ প্রশিক্ষণকালে প্রার্থী নির্বাচন ক্ষেত্র অনুন্নত সেক্টরে নিয়োজিত কর্মীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিশেষ করে কোয়ালিটি কন্ট্রল, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, পরিকল্পনা শাখা, মনিটরিং ও ইভালুয়েশন শাখার কর্মীদের প্রাধান্য দিতে হবে।

(৮) মৎস্য ও চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর মৎস্য অধিদপ্তরের মূল কাজ। এই কাজ সম্পাদন মৎস্য অধিদপ্তরের জেলা, উপজেলা ও মাঠ পর্যায়ে মৎস্য অধিদপ্তরের মোট জনশক্তির প্রায় ৭০ ভাগ নিয়োজিত। তাছাড়া বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োজিত একটি বৃহৎ জনশক্তি বিভিন্ন উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে মৎস্য ও চিংড়ি চাষ, ধান ক্ষেতে মাছের মাছ, নার্সারী ও খামারে প্রতিপালন, খামার ব্যবস্থাপনা, হ্যাচারী পরিচালনা, উন্নত ব্রুড ব্যবস্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উন্নত ও যুগপোযোগী প্রযুক্তি হস্তাস্তর ও প্রশিক্ষণ প্রদানে নিয়োজিত। তবে চিংড়ি চাষের সামাজিক সমস্যা, ইনব্রিডিং এর কারণে হ্যাচারীতে উৎপাদিত পোনার গুণগত মান, ব্রুড ব্যবস্থাপনা ও অনুরূপ কিছু সমস্যা আছে যা সমাধান করা বিশেষ প্রয়োজন। উপরোক্ত বিষয়সমূহে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উচচতর শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা প্রয়োজন। মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকসহ মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের এবিষয়ে উচচতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন এবং এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষাসূচিতে উচ্চ শিক্ষা কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

মৎস্য সম্পদের সহনশীল উন্নয়নে জলজ পরিবেশ সংরক্ষণ ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

ডঃ নিলুফা ইসলাম, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
রাগিব উদ্দিন আহ্মদ, সিইজিআইএস

ভূমিকা

পৃথিবীর ছয় শত কোটি মানুষের অর্ধেকই বসবাস করে সমগ্র পৃথিবীর মাত্র ৫ শতাংশ ভূমিতে আর তার সবটাই হল সমুদ্র উপকূল, ব-দ্বীপ ও বড় বড় নদীর অববাহিকা। অন্যান্য প্রতিবেশ বা ইকোসিষ্টেমের সাথে তুলনা করলে এসব অঞ্চল সবচাইতে উর্ব্বর আবার অন্যদিকে নাজুকও বটে। ব-দ্বীপ অঞ্চলের এই উর্ব্বরতা মানুষকে আকর্ষন করে দুর দুরান্ত থেকে সম্পদ আহরণে। সমগ্র পৃথিবীতে উল্লেখ করার মত এরকমই একটি ভূখন্ড হলো **বাংলাদেশ**। এদেশের ৭০ শতাংশ জমিই এর ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বড় বড় নদীগুলোর অববাহিকা। আর দেশের চার শতাংশেরও বেশি জুড়ে আছে বিশ্বের সবচাইতে বড় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল "সুন্দরবন"। এ ছাড়া বাকী পাহাড় ও গড় অঞ্চল জুড়ে এদেশের প্রাকৃতিক রূপ বহু দেশি ও বিদেশী পর্যটককে আর্কষন করে। এখানকার মাটির রূপ, পানির প্রবাহ, জলবায়ু ও হিমালয়ের দক্ষিণ উপকূলে এর অবস্থান প্রকৃতিকে করেছে বৈচিত্রময় ও চিহ্নিত করেছে জীব-বৈচিত্রের আঁধার হিসাবে। এখানকার হাজারো জাতের ধান আর দুইশতের ও বেশী প্রজাতির মিঠা-পানির মাছ আমাদের দিয়েছে এক ভিন্ন পরিচিতি "মাছে-ভাতে বাঙ্গালী"।

জলজ পরিবেশ ও জীববৈচিত্রের উপর উন্নয়ণ প্রকল্পের প্রভাব

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এক বিশাল ভূখন্ডের পানি উত্তরের জনপদ থেকে আমাদের ওপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ে। যে বিশাল ভূ-খন্ডের পানি আমাদের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় আমাদের গোটা দেশ তার মাত্র ৮ শতাংশ। নদীমাতৃক আমাদের দেশে বর্ষাকালে স্বাভাবিক বন্যা একটা চিরাচরিত রীতি। মাটির উর্বরতা, মাছ সহ অন্যান্য জলজ জীবের চলাচল ও প্রজনন এবং নৌ চলাচলের সুবিধার জন্য এই বর্ষা আমাদের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু অতিরিক্ত পানির কারণে অনাকাঙ্খিত বন্যার দরুন ফসল, অবকাঠামো ও জীবন যাত্রার ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়। তাই পানিকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন দেখা দেয় ষাটের দশকের গোড়া থেকেই। তখনকার প্রযুক্তি ও ঔপনিবেশিক সরকারের ধ্যান-ধারনায় শুরু হয় "বন্যা নিয়ন্ত্রণ"। নিয়ন্ত্রত এলাকায় আনা হল উচ্চ ফলনশীল বা উফশী জাতের ধান "ইরি"। বিভিন্ন কারনে ক্রমে হারিয়ে গেল অনেক স্থানীয় জাতের ধান। উচ্চ ফলন এর জন্য প্রয়োগ করতে হলো রাসায়নিক সার আর কীটনাশক। দিনে দিনে বাড়তে থাকলো সার আর কীটনাশক প্রয়োগের মাত্রা ও রকমফের। **পরিবেশে শুরু হলো বিরোধ**। বাড়তি ধান ফলাতে রাসায়নিকের ব্যবহার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো মাছসহ অন্যান্য জীববৈচিত্রের ওপর। জলজ পরিবেশের ভৌত অবস্থা ও তার গুণগত বিবর্তন, ছোট ছোট নদী মজে যাওয়া ও প্রধান নদীর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সুস্বাদু অনেক মাছই আজ দেশে বিলুপ্তপ্রায়। বাড়তি ফলন পাওয়া গেল ঠিকই, কিন্তু বিনিময়ে স্বীকার করে নিতে হল মাছের এক ব্যাপক ক্ষতি আর অনেক প্রজাতির সংখ্যা সল্পতা ও বিলুপ্তি। আবাসের গুনগত পরিবর্তন ও সংকোচনের প্রভাব পড়লো মাছ সহ অনান্য জীববৈচিত্রের উপর।

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবেশের ইতিবাচক মূল্যায়ন

আশার কথা ১৯৯২ সাল থেকে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা বা এনভায়রনমেন্টাল ইম্পেক্ট এসেসমেন্ট (EIA) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ বিভিন্ন পেশাজীবি পরিচালিত সংস্থা এখন প্রকল্প প্রণয়ণে মাছ, গাছ, বন্যপ্রানি ও মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কথা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। পরিবেশের ওপর প্রকল্পের প্রভাব নিরীক্ষা করে তার জন্য তৈরী করতে হয় "এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্লান" বা পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা। আশা করা যায় যে উন্নয়ন পরিকল্পনায় পরিবেশ বিষয়কে বাস্তব সম্মত অগ্রাধিকার দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমরা বাংলাদেশকে একটি বাসযোগ্য উন্নত দেশে পরিনত করতে পারবো। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নির্মল বাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত করতে হলে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নীতিগত ও কৌশলগত পরিবর্তন আনতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে নিরাপদ খাবার ও ব্যবহারের পানি আর পরিবেশের ভারসাম্য।

অঞ্চল	পরিধি/ক্ষেত্র	সীমাবদ্ধতা/সংবেদনশীলতা	বর্তমানে গৃহীত ব্যবস্থাপনা
	বড় হাওর	মৎস্য জীব বৈচিত্রের জন্য প্রধান এলাকা	লীজ গ্রহীতাদের সমন্বয়ে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু আছে।
	হাকালুকি হাওর	বৃহত্তম হাওরগুলির একটি, বর্ষব্যাপী মাছের আবাসস্থল	লীজ গ্রহীতাদের সমন্বয়ে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু আছে।
	কাওয়াদীঘি হাওর	মৎস্য অভিগমনের পথ বিচ্ছিন্ন, গুরুত্বপূর্ণ প্রজনন ক্ষেত্র	ফিশ-পাস স্থাপিত, মৎস্য অভয়আশ্রম ঘোষনা
দক্ষিণ-পশ্চিম	বিল ডাকাতিয়া	মৎস্য অভিগমনের পথ বিচ্ছিন্ন, পলিভরাট	বাপাউবো এর অধীন 'টাইডাল রিভার ম্যানেজমেন্ট" প্রস্তাব করা হয়েছে
	গরাই প্লাবন ভূমি	শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রবাহ হ্রাস, সুন্দর বনে শুষ্ক মৌসুমে লবনাক্ততা বৃদ্ধি	পানি প্রবাহ ফিরিয়ে আনার ও লবনাক্ততা হ্রাসের উদ্দেশ্যে গরাই নদীতে খনন
	ফকিরহাট প্লাবন ভূমি	মুক্ত জলাশয়ের মাছের জন্য সমৃদ্ধ এলাকা বর্তমানে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে রূপান্তরিত	
দক্ষিণ-কেন্দ্রীয়	চান্দা বিল	মৎস্য অভিগমনের সংযোগ সহ বৃহৎ সম্ভাবনাময় আবাসস্থল	চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের আওতায় মৎস্য অভয়আশ্রমের প্রস্তাব করা হয়েছে
	বাঘাইর বিল	সমৃদ্ধ মৎস্য সম্পদ	
	পটুয়াখালী	মুক্ত এবং আবাদি মাছের জন্য সমৃদ্ধ	
দক্ষিণ-পূর্ব	চাঁদপুর ও দাউদকান্দি	গুরুত্বপূর্ণ মৌসুমী প্লাবনভূমি এলাকা, বিভিন্ন জায়গায় FCDI দ্বারা অবনতি প্রাপ্ত	চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের আওতায় আবাসস্থল ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব করা হয়েছে।
পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ী অঞ্চল	কাপ্তাই লেক	দেশের সর্ববৃহৎ কৃত্রিম লেক, গুরুত্বপূর্ণ প্রজনন ক্ষেত্র, অতিমাত্রায় মৎস্য আহরণ	মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ও মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর আওতায় যৌথ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী
	হালদা ও কর্ণফুলী নদী	গুরুত্বপূর্ণ কার্প জাতীয় মাছের আবাসস্থল ও প্রজনন ক্ষেত্র, কাপ্তাই লেকে মৎস্য অভিগমনের পথ বিচ্ছিন্ন, দূষণ	কার্প জাতীয় মাছের ডিম ছাড়ার ক্ষেত্রগুলিকে অভয়আশ্রম ঘোষণা, সমাজ ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা
প্রধান নদী সমূহ	পদ্মা	প্রজনন ক্ষেত্র, অভিগমনের পথ, ফারক্কার কারণে পানি প্রবাহ হ্রাস, পলি ভরাট	
	ব্রহ্মপুত্র	অভিগমনের পথ, প্রচুর পলি বহন, প্লাবন ভূমির সাথে যোগাযোগ পথ বিচ্ছিন্ন	
	মেঘনা	খুবই উর্বর প্লাবনভূমির সাথে মৎস্য অভিগমনের পথ, প্রজনন ক্ষেত্র	
উপকূলবর্তী অঞ্চল	উপকূলীয় সমুদ্র বেষ্টনী	সামুদ্রিক মৎস্য ও চিংড়ির প্রাথমিক লালনক্ষেত্র। অতিমাত্রায় মৎস্য বিশেষ করে চিংড়ি আহরণ	অতিমাত্রায় মৎস্য আহরণ বন্ধের জন্য চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প কর্মসূচী প্রস্তাব করা হয়েছে
	উপকূল অদুরবর্তী সমুদ্র এলাকা	গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল ও প্রজনন এলাকা, মৌসুমভিত্তিক অতিমাত্রায় মৎস্য আহরণ	সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তা প্রয়োগে জটিলতা
	চকরিয়া, সুন্দর বন (পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ী এলাকা)	ঈষৎ লোনা পানির গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল, আবাসস্থল বিনাশ, অতিরিক্ত মাত্রায় মৎস্য আহরণ, পরিবেশের ক্ষতি সাধন করে চিংড়ি চাষ	মৎস্য অধিদপ্তর ও এনজিওর চলমান কর্মসূচী, টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রস্তাবিত
	সুন্দর বনের সংরক্ষিত অরণ্য	গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল, রামসার সাইট, অতিমাত্রায় মৎস্য আহরণ	মূল দায়িত্ব হিসাবে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যবস্থাপনা গৃহীত। ইউএনডিপি জীব-বৈচিত্র্য প্রকল্প প্রস্তাবিত

সূত্র ঃ ড্রাফট ডেভেলপমেন্ট ষ্ট্রাটেজি : এনেক্স-জি (আগষ্ট, ২০০০)

এনডব্লিউএমপি তে পরিবেশ ও জলজ সম্পদ গুচ্ছে অন্তর্ভূক্ত ১০টি কর্মসূচী ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা সমূহের নাম নিম্নে দেওয়া হলঃ

সমাজ ভিত্তিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা

মো: মাহবুবুর রহমান খান, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা
ড. পল থমসন, টিম লিডার

পটভূমি

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভ্যন্তরীণ মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মোট আয়তন ৪৯.২০ লক্ষ হেক্টর। ষাটের দশকে দেশের মোট উৎপাদনের ৮০% ভাগ মাছ উৎপাদিত হতো অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় থেকে যা বর্তমানে ৩৯% ভাগ এ নেমে এসেছে। তাছাড়া দেশের মৎস্যজীবিদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যকই প্লাবনভূমির মৎস্য আহরণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। মৎস্যজীবিগণ এবং বিশেষজ্ঞ মহল এই নেমে যাওয়ার কারণ হিসাবে জলাভূমি ভরাট, জলাশয়গুলো কৃষিজমিতে রূপান্তর, মাছ বসবাসের স্থানের অবক্ষয়, মৎস্য আহরণ চাপ বহুলাংশে বৃদ্ধি, ক্ষতিকর উপায়ে মৎস্য আহরণ, অতিরিক্ত কীটনাশক প্রয়োগ, শুস্ক মৌসুমে জলাভূমির সংকোচন ইত্যাদিকে চিহ্নিত করেন। এছাড়া স্বল্প সময়ের জন্য ইজারা দিয়ে রাজস্ব আদায়ের যে মৎস্য নীতি তা স্থানীয় মৎস্যজীবিদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য সহায়ক নয় বলে বিবেচিত হয়। তাই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থে স্থায়িত্বশীল মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে কর্মপন্থা সম্পর্কে সংলাপের সূত্রপাত করা এবং একটি প্রক্রিয়ায় একমত হয়ে প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের সহযোগিতায় সমাজ ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা (সিবিএফএম) প্রকল্পের ১ম ধাপ ১৯৯৪-২০০০ সনে বাস্তবায়িত হয়। এই ধাপে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অনুদানে সরকারি ও বেসরকারি সহযোগী সংস্থা কাজ করেছে এবং সুফলভোগী জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা উন্নত হয়েছে। ফলে ১৯টি জলমহালে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়গুলোর ক্ষমতায়ন ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নত এবং প্রাপ্ত সুফলের ন্যায্য বিতরণ সূচিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে এই কার্যক্রম আরো অধিক সংখ্যক জলাশয়ে বাস্তবায়িত করার জন্য ৫ বৎসর মেয়াদি সিবিএফএম ২য় ধাপ ২০০১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয়েছে। ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি) এর অর্থায়নে মৎস্য অধিদপ্তর, ওয়ার্ল্ডফিশ সেন্টার ও সহযোগী বেসরকারি সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণে দেশের অভ্যন্তরীন মুক্ত জলাশয়ে উন্নত মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং অংশগ্রহনমূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকার স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন ও সম্পদ হতে প্রাপ্ত সুফলের ন্যায্য বন্টন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ব্যবস্থাপনা নীতি ও কৌশল

সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের অংশগ্রহন ত্বরান্বিত করতে সহযোগী সংস্থাগুলো মৎস্য অধিদপ্তরের মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পরিকল্পনা প্রনয়ন, পরিবীক্ষণ ও এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন প্রয়াসে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করছে। সিবিএফএম প্রকল্পের ২য় ধাপে প্লাবনভূমি, নদী, হাওর ও বিলের জন্য সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কর্মধারা ও মডেল উদ্ভাবন ও যাচাই করছে। মাঠ পর্যায়ের সহযোগী সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সংশ্লিষ্ট এনজিওগুলি ১১৫টি নির্ধারিত জলাশয়ের পার্শ্ববর্তী প্রায় ২৩,০০০ মৎস্যজীবি পরিবারসমূহকে সংগঠিত করেছে। এগুলোর মধ্যে প্রায় ১৫টি জলাভূমি সিবিএফএম-১ থেকে নেওয়া হয়েছে যা স্থানীয় জলমহালের সুফলভোগী সংগঠনের স্থায়ীত্বশীলতা এবং সংগঠনসমূহ কর্তৃক প্রবর্তিত মৎস্য ব্যবস্থাপনার প্রভাব এবং তাদের আর্থসামাজিক অবস্থা যাচাই করবে। কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন জলাভূমির অর্ধেকের বেশী জলাভূমি ১০টি গুচ্ছে অবস্থিত যেখানে অনেক বিল, প্লাবনভূমি ও নদী খন্ড বিদ্যমান। তাছাড়া ৩৬টি একক জলাভূমি ১৯টি জেলায় অবস্থিত। এই জেলাগুলোর মধ্যে রংপুর, নড়াইল, বগুড়া, টাংগাইল, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, মৌলভীবাজার, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও সুনামগঞ্জ উল্লেখযোগ্য। এসব জলাভূমির ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমাজভিত্তিক সমন্বয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি যাচাই ও নিরূপন করা এবং পাইলট কার্যক্রম ও সংশ্লিষ্ট গবেষণা হতে প্রাপ্ত ফলাফল ও উন্নত ব্যবস্থাপনা কর্মধারার সাক্ষ্য প্রমানাদি যথাযথ মাধ্যম দ্বারা সকল পর্যায়ের মৎস্য নীতি-নির্ধারকদের অবগত ও প্রভাবিত করা। সমাজ ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা-২ প্রকল্পের আওতায় জলাশয়গুলোর শ্রেণীবিন্যাস ছক -১ এ দেখানো হলো।

কারিতাসের সহযোগিতায় মৎস্যজীবীরা ৮ হেক্টরের একটি অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করে এবং বর্ষার শুরুতে প্রাকৃতিক মাছের প্রজননের সুযোগ করে দেয়ার জন্য মাছ ধরা বন্ধ রেখেছে। ফলশ্রুতিতে সর্বমোট ৬৩ প্রজাতির মাছ ও চিংড়ির প্রাপ্যতা পরিলক্ষিত হয় এবং ১৯৯৯ সালে সর্বোচ্চ ৫৮ মে. টন মৎস্য আহরিত হয়। তাছাড়া ১৯৯৭-২০০০ সালের গড় মৎস্য আহরণ ১৯৯৭ সালের মৎস্য আহরণের চেয়ে ৫০% ভাগ বেশী হয়, যদিও মৎস্য আহরনের চাপ (জালের সংখ্যা) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে প্রায় দ্বিগুন হয়েছে। আহরণ চাপ অধিক সত্ত্বেও অভয়াশ্রমের প্রভাবে গুরুত্বপূর্ণ চারটি প্রজাতির (বজুরী টেংরা, টাকি, বোয়াল ও গুড়াচিংড়ি) আধিক্য বৃদ্ধি পেয়েছে যা মোট মৎস্য আহরণের প্রায় ৪০% ভাগ যোগান দেয়। অনুরূপ নড়াইল জেলার গোয়াখোলা হাতিয়ারা বিলে বাঁচতে শেখার সহযোগিতায় মহিলা প্রান্তিক মৎস্যজীবীরা কুয়াতে প্রজননক্ষম মাছ রক্ষার জন্য নেতৃত্ব দিয়েছে। সেখানে মাছের জীব বৈচিত্র্য বেড়েছে এবং মাছ আহরণ হার বেড়েছে ৩০% ভাগের বেশি।

মৎসের আবাসস্থল পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ

প্লাবনভূমি মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন, দৈহিক বৃদ্ধি ও বিচরণের জন্য বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ, রাস্তা, পুল, পানি নিস্কাশন/সেচ অবকাঠামো নির্মানের পূর্বে পরিবেশের উপর প্রভাবের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচনায় আনা হয়নি বিধায় মৎস্য প্রজনন, বিচরণ ও জীবনচক্রের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। পলি পড়া, নদী ও বিলের সংযোগ নষ্ট হয়ে যাওয়া, জলাভূমি ভরাট এবং নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলেও মাছের আবাসস্থলের ক্ষতি হয়। তাই মাছ ও অন্যান্য জলজ সম্পদ জলাভূমির পরিবর্তনের ফলে দ্রুত কমে যাচ্ছে। তাছাড়া অতিরিক্ত আহরণ জলজ সম্পদ কমে যাওয়ার আর একটি অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে সমাজ ভিত্তিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা-২ প্রকল্পের আওতায় মাছের আবাসস্থল পুনপ্রতিষ্ঠিত করার অংশ হিসাবে ১৪টি জলাশয় খনন করে সমাজের লোকজনকে সাহায্য করা হচ্ছে, ফলে মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধিতে প্রভাব পড়তে পারে। টাংগাইল জেলায় স্থানীয় জনগণ কর্তৃক সিএনঅরএস সহযোগিতায় শিংহরাগী বিল ও ধলেশ্বরী নদীর সংযোগ খাল পুন:খনন করা হলে এসব জলমহালে মৎস্য উৎপাদন পরিমাণ প্রায় ৬ গুণ বেড়ে যায়। তাছাড়া এখানে দেশীয় রুই জাতীয় মাছের পুনঃমজুদ করা হয় ফলে মাছের প্রজাতির সংখ্যা ৪৬ হতে ৬৩ টিতে বেড়ে যায়।

ক্ষতিকারক জালের প্রভাব কমানো

মুক্ত জলাশয়ে ক্ষতিকারক জাল বা পদ্ধতি দ্বারা মাছ ধরা একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ও বহুল প্রচলিত। প্রধান ক্ষতিকারক জালের মধ্যে কারেন্টজাল, পাটাজাল ও বেড় জাল (মশারী) উল্লেখযোগ্য। কোন কোন অঞ্চলে পাটাজালকে আড় বান্দাল বলে যা মাছের স্বাভাবিক চলাচল বা গমনাগমনের উপর বাঁধার সৃষ্টি করে। কারেন্ট জাল ফাঁস জালের মতই এক সূতার দ্বারা তৈরি জাল যা মাছের দৃষ্টি এড়িয়ে জলাশয়ে চলাচলকারী ছোট বড় সকল মাছকে আটকাতে পারে। বেড় জাল যা মশারীর চেয়েও ঘন লাইলন কাপড় দিয়ে তৈরি তা রেনু পোনাসহ সকল প্রজাতির মাছকে ধরতে পারে এবং ধৃত মাছের বেশীর ভাগই পোনা বা কিশোর শ্রেণির যা মাছের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার মূল কারণ। সমাজ ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা-২ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত জলাশয়ে উল্লেখিত ক্ষতিকর জালসমূহ ব্যবহার বন্ধ বা কমানোর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মাগুরা জেলার ফটকী নদী সংযুক্ত প্লাবন ভুমির মাছগুলোর প্রধান আধার যা প্রায় ৪৯টি আড় বান্দাল দিয়ে মাছের চলাচলের পথ বন্ধ করে আহরিত হতো। বর্তমানে সিএনআরএস এবং মৎস্য অধিদপ্তরের সহযোগিতায় এই সকল আড় বান্দাল স্থানীয় লোকজন স্বপ্রনোদিত হয়ে সরিয়ে ফেলেছে।

জলাশয়ে দূষন প্রতিরোধ কমানো

জলাশয় দূষণ পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি সহ মাছের স্বাভাবিক ভাবে বড় হওয়া রোধ করে, প্রজননে বিঘ্ন ঘটায়, রেণু/পোনা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, জীব বৈচিত্র নষ্ট হয়, প্রজাতি বিশেষে বিলুপ্ত হয়, মাছে রোগ দেখা দেয়, এবং মাছের সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। সর্বোপরি জলাশয়ের পরিবেশ মাছের বাঁচার, প্রজননের ও বৃদ্ধির অনুকূলে সহনীয় না হলে মৎস্য সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধি করা যাবে না। সমাজ ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় জলাশয়ের পরিবেশ দূষণ থেকে মুক্ত থাকর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত নান্দিনার বিল সংলগ্ন রংপুর ডিস্টিলারিজ ও কেমিক্যাল লিমিটেড নামে একটি কারখানা রয়েছে। এটা বিলকে দূষিত করছে। বিলে কারখানা নির্গত বর্জ্য পানি প্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কোন পদক্ষেপ নেয়নি। ফলে মাছ ক্রমে হ্রাস পাচ্ছিল কিন্তু মৎস্যজীবিরা একক ভাবে এটা প্রতিরোধ করার জন্য কিছুই করতে পারেনি। সিবিএফএম-২ প্রকল্প মৎস্যজীবিদের সংগঠিত হতে সহায়তা করে। বেলা, মৎস্য অধিদপ্তর ও ব্র্যাকের কর্মকর্তাগন ঐ স্থান পরিদর্শন করেন এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে দূষন, পরিবেশের ও মৎস্যজীবিদের উপর এর প্রভাব এবং

সরঞ্জাম ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ বিষয়াদির উল্লেখ রয়েছে যা সম্পদের গুরুত্ব, চাহিদা, সহজ লভ্যতা সমন্বয় করে সম্পদের উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি করবে। সমাজ ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা-২ প্রকল্পের সহযোগী সংস্থা বেলা সামাজিক সংগঠনগুলোকে প্রশিক্ষণসহ আইনগত সহায়তা প্রদান করছে। ২০০৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ৬টি জলাভূমির আদালতে গড়ানো সমস্যার আইনগত সমাধানে সাহায্য করেছে যার সবগুলোর ফলাফল মৎস্যজীবিদের অনুকূলে ছিল। বেলা মৎস্য প্রশাসন বিষয়ক নীতি, আইন ও প্রতিষ্ঠানের ওপর গবেষণা কার্যক্রম গ্রহন করেছে এবং আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান করছে। এছাড়াও বেলা সহযোগী সংস্থা ও সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য পরিবেশ রক্ষার আইন তথা মৎস্য সংরক্ষণ আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে।

দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিকল্প কর্মপন্থা

সিবিএফএম-২ এর সহযোগী বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, স্বাক্ষরতা এবং ঋণদানের মাধ্যমে দরীদ্র মৎস্যজীবির উন্নয়ন এবং মৎস্য ব্যবস্থাপনার জন্য সহযোগীতা প্রদান সম্ভব। সব সহযোগী সংস্থাগুলো প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষা উন্নয়নের মাধ্যমে গরীব মৎস্যজীবিদের দক্ষতা, উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতঃ মাছ প্রক্রিয়াজাতকরন ও বিকল্প আয়ের উৎস সৃষ্টির জন্য ঋণ প্রদান করছে।

গবেষণা কার্যক্রম

সামাজিক সংগঠনের উপর গবেষণা এবং কার্যক্রমের সাথে সিবিএফএম এর প্রভাবের সমন্বয় করা হচ্ছে। ভিত্তি জরিপ ও ফলাফলের প্রভাবের ওপর খানা জরিপ প্রকল্পের সব এলাকাতে এবং ১৭টি নিয়ন্ত্রণ এলাকায় (যেখানে প্রকল্পের কোন কার্যক্রম নেই) সম্পাদন করা হয়েছে। সকল এলাকাতেই মৎস্য আহরন পরিবীক্ষন করা হচ্ছে। প্রকল্পের ৪টি জলাশয়ে মাছের সহনশীল আহরণযোগ্য মজুদ নির্ণয়ের জন্য গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া ১৭টি এলাকায় পরিবার পর্যায়ে মৎস্য আহরণ ও দৈনন্দিন খাদ্যে মাছ গ্রহণের পরিমাণ সম্পর্কে সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। নদী ও জলাশয়ে মৎস্য অভয়াশ্রম নকশা ও দূষনের প্রভাব এর উপর গবেষণা বাংলাদেশে মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মাধ্যমে পরিচালনার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

প্রচারনার জন্য সংরক্ষণ

ফেমকম বাংলাদেশ একটি প্রচারনা প্রতিষ্ঠান যা ১৯৯৬ সাল থেকে মৎস্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়ের উপর কাজ করে আসছে। মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য ব্যবস্থাপনা বিষয়াদিসহ সিবিএফএম কার্যক্রমের উপর প্রচার সামগ্রী তৈরির মাধ্যমে প্রকল্পকে সহযোগীতা করছে। এসব অডিও ভিজুয়্যাল সামগ্রীর লক্ষ্য হচ্ছে নীতি নির্ধারক ও সাধারন জনগোষ্ঠীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবহিত করা। ইতিমধ্যে ৭ খন্ডের একটি মৎস্য বিষয়ক ভিডিও নাটক এবং সিবিএফএম ও মুক্ত জলাশয়ের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রামান্য চিত্র তৈরি করা হয়েছে। দুটি টিভি স্পট তৈরি করা হয়েছে ও ২০০২ সালে প্রদর্শন করা হয়েছে এবং আরও নির্মানাধীন রয়েছে। লোকনাট্য কর্মসূচীর আওতায় ফেমকম প্রায় ২৫০ জন লোক শিল্পীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে এরা প্রকল্পভূক্ত এলাকার সাধারণ জনগণের নিকট সিবিএফএম প্রকল্পের কর্মধারা এবং মৎস্য বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা ও এগুলোর স্থিতিশীল সমাধানের বিভিন্ন শ্লোগান তুলে ধরবে।

ক্ষমতা বাড়ানো ও বাড়তি জীবিকার সংস্থান

সিবিএফএম-২ প্রকল্পের সহযোগী বেসরকারি সংস্থাসমূহের লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্র মৎস্যজীবীদের স্বাক্ষরতা, প্রশিক্ষণ, মৎস্য ব্যবস্থাপনার ক্ষতিপূরণ করতে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে জীবিকার উন্নয়ন করা। সব সহযোগী সংস্থাগুলোই উদাহরণ স্বরূপ প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষা উন্নয়নের মাধ্যমে গরীব মৎস্যজীবীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও অন্যান্য বিকল্প আয়ের জন্য ঋণ প্রদান করছে।

ভিত্তিক সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ও পরিবেশ সহনীয় চিংড়ি চাষ পদ্ধতি প্রবর্তন করা।

পরিবেশ সহায়ক চিংড়ি চাষ ঃ

অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, মাটি ও পানির গুণগত মান, জীববৈচিত্র এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সংরক্ষণ করে সর্বসাধারনের মতামতের ভিত্তিতে পরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষ করাই পরিবেশ সহনীয় চিংড়ি চাষ। এ ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ বিপন্ন হবে না এবং কেহ ক্ষতিগ্রস্থ হবে না।

পরিবেশ সহায়ক চিংড়ি চাষের কৌশল ঃ

১। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত ও উপযুক্ত এলাকায় চিংড়ি চাষ করতে হবে। অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে চিংড়ি চাষের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

২। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উন্নত পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য ঘেরের আয়তন ছোট করতে হবে। ঘেরের আয়তন ৫-২০ হেক্টর হওয়া আবশ্যক। ছোট ঘের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার সহায়ক।

৩। ঘেরের সীমানা নির্ধারণের জন্য চতুর্দিকে মজবুত বেড়ীবাঁধ থাকা আবশ্যক। ইহা ঘেরের আকৃতি নির্ণয় করে, পানি ধরে রাখে প্রনীর চলাচল নিয়ন্ত্রনে রাখে এবং বন্যা/প্লাবন থেকে ফসল রক্ষা করে। বাঁধের উচ্চতা সঠিক রেখে মজবুত বাঁধ নির্মাণ করতে হবে।

৪। পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা উৎপাদনের সহায়ক। পানির উপযুক্ত উৎস্য ব্যাতিরেকে ঘের স্থাপন করা উচিত নয়। ঘেরে পানি আদান-প্রদানের জন্য পৃথক সরবরাহ ও নিষ্কাশন গেট স্থাপন করতে হবে। নিয়মিত পানি পরিবর্তণ ভাল উৎপাদনের সহায়ক। পানি আগমন ও নির্গমন গেট এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে চাহিদা অনুযায়ী যে কোন মুহূর্তে পানি আদান-প্রদান করা যায়। পানি আদান-প্রদানের ফলে পানিতে অক্সিজেন যোগ হয়, নতুন খাদ্য আসে এবং ভাল পানি পাওয়া যায়। ইহাতে পুরাতন পানির দূষণীয়ভাব হ্রাস পায়।

৫। চিংড়ি ঘেরের পরিবেশ উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিতভাবে খামার প্রস্তুত করতে হবে। খামার প্রস্তুতির ধাপ সমূহ হলো ঃ

* ক্ষতিকর আগাছা পরিষ্কার করতে হবে।
* রাক্ষুসে ও ক্ষতিকার প্রাণি অপসারণ করতে হবে।
* পুরাতন পানি নিষ্কাশন করে ৬-৭ দিন রোদে শুকাতে হবে।
* বাঁধ মেরামত পূর্বক সৃষ্ট সকল গর্ত বন্ধ করতে হবে।
* তলায় হালকা চাষ দিতে হবে।
* ঘের ধৌত করতে হবে (পানি উঠিয়ে একদিন পর বের করে দিতে হবে)।
* প্রতি শতকে ১ কেজি পরিমাণে চুন প্রয়োগ করতে হবে।
* চুন প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর প্রতি শতকে ৮-১০ কেজি জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে।
* প্রথমতঃ ৭-১০ সেঃমিঃ পানি তুলে ৫-৭ দিন অপেক্ষা করতে হবে।
* অতঃপর ২৫-৩০ সেঃমিঃ পানি বৃদ্ধি করে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে।

৬। রাসায়নিক সার জৈব সারের সাথে জলজ প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের সহায়ক। তবে অতিরিক্ত সার প্রয়োগ করা হলে পরিবেশ বিনষ্ট হয়। তাই পরিমিত সার প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগ মাত্রা নিম্নরূপ ঃ

* ইউরিয়া = ১০ গ্রাম প্রতি শতকে।
* টিএসপি = ১০ গ্রাম প্রতি শতকে।

- একদিন অন্তর ৩ বার সমপরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পর পানির রং সবুজ হলে ৫০-৬০ সেঃমিঃ পর্যন্ত পানির গভীরতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হলে পোনা মজুদ করতে হবে।
- নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পোনা মজুত করা হলে পোনার মৃত্যুর হার কম হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হবে।
- পানির গভীরতা ৭০-৮০ সেঃমিঃ সংরক্ষন করতে হবে।

৭। সকল ঘেরেই নার্সারী থাকা আবশ্যক। নার্সারীর আয়তন ১.০০ একর হলে ভাল হয়। এক একর নার্সারীতে ৫০,০০০ পোনা মজুত করা যায়। নার্সারীতে পোনার বয়স ২০-২৫ দিন হলে ঘেরে অবমুক্ত করতে হবে। একটি নার্সারী পুকুর পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাবারযুক্ত এবং রাক্ষুসে প্রাণি ও ক্ষতিকর প্রাণিমুক্ত রাখতে হবে।

৮। পারিপার্শ্বিক ও অন্যান্য কারণে বর্তমান চাষ পদ্ধতিতে প্রায় ৬৫-৭০ ভাগ পোনা মারা যায়। এ অবস্থা উত্তরণের জন্য সঠিক সময়ে ঘেরে সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত পোনা মজুত করতে হবে। ফেব্রুয়ারি-মে মাস পোনা মজুতের উপযুক্ত সময়। শীতের আগ মুহূর্তে এবং বর্ষা মৌসুমে পোনা মজুত করা উচিত নয়। অতিরিক্ত পোনা মজুত উৎপাদনের সহায়ক নহে। বর্তমান চাষ পদ্ধতিতে প্রতি হেক্টরে ২০-২৫ হাজার পোনা মজুত করা যায়। তবে কিস্তিতে পোনা মজুত করা হলে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

৯। মাটির গুণগত মান, ঘেরের উপযুক্ত পরিবেশ এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক খাদ্যের উপর চিংড়ি চাষের সাফল্য নির্ভর করে। চিংড়ি ঘেরের পরিবেশ নিম্নরূপ থাকা আবশ্যক ঃ

* পানির লবণাক্ততা = ১০-২৫ পিপিটি।
* পানির গভীরতা = ৬০ সেঃ মিটারের উর্দ্ধে ও ১.২ মিটারের কম।

বাগদা চিংড়ির নার্সারী ব্যবস্থাপনা

হাবিবুর রহমান খোন্দকার

১। ভূমিকা ঃ

চিংড়ি চাষে সুস্থ সবল পোনা চাষ ক্ষেত্রে মজুদ করা চিংড়ি চাষের প্রাথমিক শর্ত। ভালো পোনার জন্য প্রয়োজন ভালো হ্যাচারী ও নার্সারী ব্যবস্থাপনা। হ্যাচারীতে উৎপাদিত পোনা নার্সারীতে প্রতিপালন করার ব্যবস্থা যথাযথ না থাকায় খামারে পোনা বেঁচে থাকার হার অত্যন্ত কম। মজুদকৃত পোনার মাত্র ২৫-৩০% পোনা বড় হবার সুযোগ পায় এবং খামার থেকে আহরিত হয়। সরাসরি পোনা চাষ ক্ষেত্রে ছাড়া হলে প্রায়শঃ সুষ্ঠু পরিবেশের অভাবে পোনার মৃত্যু হার বেড়ে যায়। চাষ এলাকার ১০-২০% এলাকায় নার্সারী নির্মাণ করে খামারের মোট মজুদ হার বর্তমান মজুদ হারের চেয়ে বেশী করা সম্ভব।

২। নার্সারীর ধরণঃ

২.১. পুকুর নার্সারীঃ এ জাতীয় নার্সারীর জন্য পৃথক পুকুর তৈরী করতে হয়। চাহিদানুযায়ী পাশাপাশি কয়েকটি পুকুর নির্মান করা যায়। এজন্য পনি সরবারহ ও নির্গমনের খালের ব্যবস্থা রাখতে হবে। মাটি ও পানির গুনাগুন অবস্যই চিংড়ি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় গুনাগুন সম্পন্ন হতে হবে। পুকুরে পানি সরবারহ ও পানি বেড় করার জন্য গেট রাখতে হবে। পানি উত্তলন গেটে অনাহুত প্রনী নিয়ন্ত্রন ও রোধের জন্য ০.২ মিমিঃ ফাস যুক্ত নেট স্থাপন করতে হয়। পানি নির্গমন গেটে পোনা ধরার জন্য নেট স্থাপনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। পানির গভীরতা যেন ৬০ সেমিঃ রাখা যায় সেভাবে পাড়ের উচ্চতা ও অবকাঠামোদি নির্মান করতে হবে। প্রতি পুকুরের আয়তন ০.৪০ হেঃ (১ একর) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা গেলে ব্যবস্থাপনার সুবিধা হয়। পুকুরে পানি সরবারহের জন্য পাম্পের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ জাতীয় নার্সারীতে প্রতি বর্গমিটারে ২০-৩০ টি পোনা মজুদ করা যায়।

২.২. ঘের নার্সারীঃ এ জাতীয় নার্সারী সাধারনত ঘের এলাকায় তৈরী করা যায়। এ জন্য ঘেরের উচু এবং সহজে পানি সরবারহ ও বের করা যায় এরুপ স্থান নিবার্চন করতে হয়। পুকুরে তলদেশ সমতল এবং ঢাল যুক্ত হতে হবে যেন সহজে পানি বের করা যায় এবং পোনা ধরা যায়। সুবিধানুয়ী ঘেরের আয়তন নির্ধারন করা হয় তবে আয়তন ১ একররর বেশী না হওয়াই উত্তম। ৬০ সেমিঃ পানি ধরে রাখা যায় এরুপভাবে বাঁধ নির্মান করতে হবে এবং পুকুর নার্সারীর ন্যায় সুবিধাদি সৃষ্টি করা গেলে ভালো ফল পওয়া যায়। এজাতীয় নার্সারীতে ঘেরে/খামারে অন্য ফসল উৎপাদনের সময় বা ঘের শুকানোর সময় পোনা প্রতিপালন করা যায়। আমাদের দেশে ইতিমধ্যে এ জাতীয় নার্সারীর জনপ্রিয়তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতি বর্গমিটারে ১৫-২০ টি পোনা মজুদ করা যায়।

২.৩. পেন নার্সারীঃ আমাদের দেশে চিংড়ি চাষের জমি প্রায়ক্ষেত্রে বছরভিত্তিক ইজারা নেয়া হয়, এ ক্ষেত্রে চাষী ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নার্সারী পুকুর নির্মাণ করতে পারেণ না। এ অবস্থায় একই ঘেরে/খামারে পেন স্থাপন করে নার্সারী ব্যবস্থাপনা করা যায়। খামারের যে অঞ্চলে পনির গভীরতা সর্বচ্চ ৬০ সেমিঃ এবং পানি সবসময় দূষন মুক্ত থাকে এরুপ স্থান পেনের জন্য উপযুক্ত। পেনের নেট নিয়মিত পরিস্কার করতে হয় যেন পানি চলাচল ব্যহত না হয় এবং নিয়মিত নেট পরীক্ষা করে পোনা বেড় না হয়। এ জাতীয় নার্সারীতে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করে পোনা প্রতিপালন করতে হয়। প্রতি বর্গমিটারে ২০-২৫ টি পোনা প্রতিপালন করা যায়।

২.৪. ভাসমান কেস নার্সারীঃ খাল, নদী, গভীর পানি এলাকা বা চাষ পুকুরে এরূপ নার্সারী স্থাপন করা যায়। সাধারনত ৩ মিটার চওড়া ২মিটার চওড়া এবং ১ মিটার গভীর হাপা জতীয় কেস নির্মান করে যে কোন ধরনের ভাসান (Float) ব্যবহার করে খাচাকে ভাসিয়ে রাখা হয়। প্রতি বর্গ মিটারে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করে ৩০-৩৫ টি পোনা প্রতিপালন করা সম্ভব।

৩। চিংড়ি উৎপাদনে নার্সারী ব্যবস্থাপনা ঃ

খামারে মজুদের জন্য প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত পোনা যেমনি একটি সময় পর্যন্ত নার্সারীতে রেখে যত্ন নিতে হয় তেমনি হ্যাচারীতে উৎপাদিত পোনাও নার্সারীতে প্রতিপালন করে খামারে মজুদ করতে হয়। প্রথম অবস্থায় চিংড়ি পোনা যত্ন নেয়া হলে খামারে পোনার বাঁচার হার বেড়ে যায় এবং পোনা টেকসই হয়। ১৯৮৮ সনে দেশে নার্সারী ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটে। এ সময় প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত পোনা নার্সারীতে প্রতিপালন কার্যক্রম সীমিত আকারে কক্সবাজার অঞ্চলে শুরু হয়। বর্তমানে কক্সবাজার অঞ্চলে হ্যাচারীতে উৎপাদিত ছোট আকারের পোনা অর্থাৎ পি-এল.

গ. স্বাস্থ্য পরিচর্যাঃ

নার্সারীতে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত পরিবেশ রাখা বাঞ্ছনীয়। চিংড়ির বেশীরভাগ ভাইরাস রোগের উৎপত্তি নার্সারী ও হ্যাচারী থেকে। এক একটি ট্যাঙ্কে এক সপ্তাহের বেশী পোনা প্রতিপালন না করে পোনাকে নতুন ট্যাঙ্কে স্থানান্তর করতে হয়। প্রতিবার ব্যবহারের পর ট্যাঙ্ক ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। প্রতিদিন দুবার প্রতিপালন ট্যাঙ্কের তলদেশ থেকে অব্যবহৃত খাদ্য ও ময়লা সরিয়ে ফেলতে হবে। পোনার দেহ নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে এবং পরজীবি সংক্রমনমুক্ত রাখতে হবে। পরজীবিমুক্তকরণের জন্য ২০% হারে ফরমালিন ব্যবহার করা যায়, ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস ইত্যাদি মুক্তকরণের জন্য অন্যান্য অনুমোদিত জীবাণুনাশক বেশ কার্যকর। প্রতিপালন ট্যাঙ্কের পানি প্রতিদিন ১০-২০% পরিবর্তন করতে হয়, লবণাক্ততা বাড়ানো বা কমাবার জন্য লবণাক্ততার তারতম্য প্রতিদিন ১-২ পিপিটির বেশী যেন না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৩.২. খামারে পালন এলাকায় মজুদ পূর্ব নার্সারী ব্যবস্থাপনাঃ

চাষক্ষেত্রে নার্সারী ব্যবস্থাপনায় নিম্নের সুবিধাসমূহ পাওয়া যায়ঃ

১) নার্সারী পুকুরে সহজে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন করা যায়, যা পোনার জন্য অতি প্রয়োজনীয় খাবার।
২) পোনাকে সহজে সম্পুরক খাদ্য খাওয়ানো যায়।
৩) চিংড়ি পোনার উপযুক্ত পরিচর্যা করা যায়।

ক. নার্সারী পুকুর প্রস্তুতি

যথাযথভাবে নার্সারী পুকুর প্রস্তুত করা গেলে পুকুরে প্রকৃতিক খাদ্য উৎপাদন ও উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা যায়, এজন্য-

- পুকুরের তলদেশ প্রতিবার ফসল আহরনের পর শুকাতে হবে। মাটি এমনভাবে শুকাতে হবে যেন মাটিতে দাড়ালে ২ সেমিঃ পরিমান মাটি দেবে যায় বা মাটি হাত দিয়ে দলা বাঁধা যায়।
- চাহিদানুযায়ী চূন প্রয়োগ করতে হবে এজন্য কলিচূন ($Ca(OH)_2$) ব্যবহার করা যায়। সাধারণভাবে হেক্টর প্রতি ২৫০ কেজি চূন দিতে হয়, ঢ়ঐ তারতম্য অনুযায়ী চূনের মাত্রা নির্ধারণ করা গেলে ভালো ফল পাওয়া যায়।
- পর্যায়ক্রমে পানি তুলতে হবে এতে পানিতে প্রকৃতিক খাদ্য সঠিকভাবে উৎপাদন করা যায়। প্রথমে ১০ সেমিঃ পনি তুলে একর প্রতি ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া ৪০০গ্রাম টিএসপি, ও ২ কেজি জৈব সার (গোবর/খাদ্য/কম্পজ ইত্যাদি) পানিতে গুলে ছিটিয়ে দিতে হবে। প্লাঙ্কটন ঠিকমত উৎপাদিত হচ্ছে কিনা তা সেকী ডিস্ক/রং/গ্লসে পানি নিয়ে পর্যবেক্ষন করতে হবে। প্লাঙ্কটন অভিষ্টমাত্রায় উৎপাদিত হলে সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে। একনাগারে ৭ দিনের বেশী সার প্রদান করা যাবে না। প্লাঙ্কটনের উৎপাদন নিশ্চিত না করে পোনা মজুদ করা যাবে না।
- রাক্ষুসে ও প্রতিযোগী প্রানী নিয়ন্ত্রন করতে হবে, পানি উত্তোলনের সময় ভালোভাবে ছেকে নিতে হবে। প্রয়োজনে এ জাতীয় প্রনী নিয়ন্ত্রনের জন্য চা বীজ খৈল ব্যবহার করা যায়। অতি সাবধানে এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহন পূর্বক হেক্টর প্রতি ১০০-১৫০ কেজী চাবীজ খৈল ব্যবহার করা যায়।

খ. নার্সারীতে পোনা মজুদপূর্ব করণীয় ঃ

খামারের নার্সারীতে হ্যাচারী বা প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত পোনা মজুদ করা যায় সুস্থ সবল সম আকৃতিকর পোনা নার্সারীর পানিতে খাপ খাইয়ে মজুদ করতে হয়। মজুদের পূর্বে অবশ্যই পানির গুণাগুণ সঠিক মাত্রায় আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে এ জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক পোনা হাপাতে এক রাত্রি রেখে বাঁচার হার যাচাই করা যায়। সন্ধ্যা অথবা সূর্য ওঠার আগে মজুদ পোনা আলোকে ক্লেশ থেকে মুক্ত থাকে। প্রখর রোদ্রে পোনা মজুদ করা উচিত নয়। মজুদের পূর্বে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের মজুদ ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

নার্সারীতে নিয়মিত সম্পুরক খাবার হিসাবে ফ্যাক্টরীতে তৈরী পিলেট (স্টার্টার) ব্যবহার করা যায়। এছাড়া খামারে প্রস্তুত খাবারও দেয়া যায়। নার্সারী পুকুরে পানির গভীরতা ৬০ সেঃমিঃ রাখতে হবে, পানির গুণগতমান যদি সঠিক পর্যায়ে থাকে তবে পানি পরিবর্তন না করাই উত্তম। যে সব নার্সারীতে প্রতি বর্গমিটারে ৩৫টির বেশী পোনা মজুদ করা হয় সে সব নার্সারীতে এরিয়েশন দরকার। পানির সফল ব্যবস্থাপনার উপর নার্সারীর সফলতা নির্ভর করে।

গ. পোনা সংগ্রহ ও মজুদ পুকুরে স্থানান্তরকরণ ঃ

নার্সারী পুকুর থেকে পালন পুকুরে পোনা স্থানান্তরকরণ বেশ সতর্কতার সাথে করতে হয়। পোনা স্থানান্তরের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে-

- পোনা যেন আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। সুর্যের প্রখন আলোয় পোনা ধরা যাবে না।

মাছ চাষে উদ্ভুত সমস্যা সমাধানের উপায়

মোঃ মনিরুজ্জামান
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাংলাদেশের মাছ চাষ দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। পূর্বে সনাতনী পদ্ধতিতে মাছের চাষ হত। এতে শুধুমাত্র মাছের পোনা মজুদ করা হত। কোনরূপ খাদ্য, সার ও চুন বা রাসায়নিকের ব্যবহার হত না। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই। বর্তমানে পুকুর/খামারে আধা নিবিড় থেকে নিবিড় পদ্ধতিতে মাছের চাষ করা হয়। এ পদ্ধতিতে চুন, সার, খাদ্য ও রাসায়নিকের ব্যবহার বেড়েছে। তাছাড়া এ পদ্ধতিতে অধিক ঘনত্বে মাছের চাষ হচ্ছে। ফলে মাছের উৎপাদন বেড়েছে। কিন্তু এতে পুকুরে মাছ চাষে নানারূপ সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে। উদ্ভুত এ সমস্যার কারণে মৎস্য চাষ বহু ক্ষেত্রে ব্যহত হয়। এ নিবন্ধে কতিপয় সমস্যা ও তার প্রতিকার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

২) পানিতে অক্সিজেনের অভাবে মাছের খাবি খাওয়া

মাছ পানি থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে। তাই পানিতে যথেষ্ট দ্রবীভূত অক্সিজেন থাকা দরকার। পুকুরে পানির উপরে বাতাস প্রবাহিত হলে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। এ সময় বাতাস থেকে যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন পানিতে মিশে থাকে। তাছাড়া পানিতে উদ্ভিদ খাদ্য তৈরীর সময়ও অক্সিজেন নিঃসরণ করে। এভাবে পুকুরের পানিতে মাছের অক্সিজেনের চাহিদা পুরণ হয়। সকালের দিকে বা দিনের অন্যান্য সময় যদি মাছ পানির উপর ভেসে খাবি খেতে থাকে তবে বুঝতে হবে পুকুরে অক্সিজেনের অভাব হয়েছে। কোন কোন সময় বৃষ্টির পর অক্সিজেনের অভাব হয়। এরূপ হলে বৃষ্টির পর পরই মাছ পানির উপরে খাবি খেতে থাকে। পুকুরের পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ ৫ মিলিগ্রাম/লিটার এর নীচে নেমে গেলে মাছের এ সমস্যা হতে পারে।

পানিতে অক্সিজেন অভাবের লক্ষণ ঃ

মাছ পানির উপর ভেসে উঠে খাবি খায়। মাছ ক্লান্তভাবে পানির উপরিভাগে ঘোরাফেরা করে। পুকুরের শামুক ও ঝিনুক কিনারে এসে জমা হয়। অক্সিজেনের অভাব খুব বেশী হলে মাছ মরতে শুরু করে। অক্সিজেনের অভাবজনিত মৃত মাছের মুখ খুলে থাকে এবং ফুলকা ফেটে যায়।

অক্সিজেনের অভাব দুর করার উপায়

(ক) পানিতে সাতার কাটা, বাঁশ দ্বারা পানির উপরে পেটানো, হররা টেনে তলার গ্যাস বেড় করে দেয়া।

(খ) পুকুরে পাম্প বসিয়ে পুকুরের পানি সঞ্চালন করে ঢেউয়ের সৃষ্টি করা। খামারে এজিটেটর থাকলে তা চালাতে হবে। সম্ভব হলে বাহির থেকে নতুন পানি সরবরাহ করা শ্রেয়। এ অবস্থা হলে সম্পূরক খাদ্য ও সার ব্যবহার কমিয়ে বা বন্ধ করে দিতে হবে। এছাড়া পুকুরে শতাংশ প্রতি ১-২ কেজি হারে চুন দেয়া যেতে পারে।

৩) কার্বন ডাই-অক্সাইড জনিত পানি দূষণ

কোন কারণে মুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অত্যাধিক বেড়ে গেলে মাছের দেহে বিষক্রিয়া শুরু হয়। পানিতে অক্সিজেন কমে যায়। এতে মাছের শ্বাস কষ্ট হয়। পুকুরের পানিতে মুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রয়োজনীয় মাত্রা উর্ধে ১২ মিলিগ্রাম/লিটার।

কার্বন ডাই-অক্সাইড নিয়ন্ত্রণ করার উপায়

(ক) পানির উপর বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে, হররা টেনে, সাতার কেটে, পুকুরে পাম্প বসিয়ে, এজিটেটর ব্যবহার করে পানিকে আন্দোলিত করতে হবে।

(খ) পুকুরে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

(গ) সার প্রয়োগ করে উদ্ভিদ কণার পরিমাণ বাড়াতে হবে।

(ঘ) সুযোগ থাকলে নতুন পানি পুকুরে সরবরাহ দিতে হবে।

(ঙ) মাছ ছাড়ার পূর্বে পুকুর তৈরীর সময় অতিরিক্ত কাঁদা সরিয়ে ফেলতে হবে।

(৪) এ্যামোনিয়া জনিত সমস্যা

পানিতে এ্যামোনিয়া বেড়ে গেলে পানির রং তামাটে অথবা কালচে রংয়ের হয়। মাছের ছুটাছুটি বেড়ে যায়। মাঝে মাঝে মাছ লাফিয়ে পানির উপরে উঠে আসে। এ্যামোনিয়া বেশি হলে মাছ মারা যেতে পারে। পুকুরের পানির এ্যামোনিয়ার মাত্রা ০.০২৫ মিঃ গ্রাম/লিটার এর উর্ধে উঠলে মাছের এ সমস্যা হতে পারে।

অতিরিক্ত এ্যামোনিয়া নিয়ন্ত্রণ

(ক) মাছের মজুদ ঘনত্ব কমাতে হবে।

(খ) সার ও খাদ্য প্রয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে।

(গ) পুকুরের পানি কমিয়ে নতুন করে পানি সরবরাহ করতে হবে।

নিয়ন্ত্রণের উপায়

প্রতি শতাংশ ১২-১৫ গ্রাম তুঁতে বা কপার সালফেট অনেকগুলো ভাগ করে ছোট ছোট পোটলায় বেঁধে পানির উপর থেকে ১০-১৫ সেন্টিমিটার নীচে বাঁশের খুঁটিতে বেঁধে রাখতে হবে। এতে বাতাসের ঢেউয়ের ফলে শাওলা তুঁতের সংস্পর্শে আসবে এবং পোটলার ভিতর থেকে গলে তুঁতে পানিতে মিশে শ্যাওলা দমন করে। সম্ভব হলে পানি পরিবর্তন করতে হবে। মাছের খাদ্য কমিয়ে দিতে হবে। শতাংশ প্রতি ৮০০-১২০০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করতে হবে।

১০) পানির উপর লাল স্তর

পুকুরের পানির উপর লাল স্তর পড়লে তা তুলে ফেলবার ব্যবস্থা করতে হবে। ধানের খড়ের বিচালী বা কলা গাছের পাতা পেচিয়ে দড়ি তৈরি করে পানির উপর দিয়ে ভাসমান অবস্থায় টেনে এক জায়গায় তা জমা করতে হবে। তারপর কাপড় দিয়ে তা নিয়মিতভাবে তুলে ফেলতে হবে। বাতাসের প্রবাহের ফলে পুকুরের একপাশে জমে থাকা লাল স্তরের উপর ইউরিয়া ছিটিয়ে দিলে তা দমন হবে।

১১) পুকুরে পানির ঘোলাত্ব

পুকুরে ভাসমান পদার্থ বা ক্ষুদ্র মাটিকনার জন্য অত্যাধিক ঘোলায় মাছ চাষে বিঘ্ন ঘটলে প্রতি শতাংশ ৮০-১৬০ গ্রাম হারে এ্যালোমিনিয়াম সালফেট বা ফিটকিরি পানির সাথে মিশিয়ে পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। এসব পুকুরে তৈরির সময় তুলনামূলকভাবে জৈব সার বেশি ব্যবহার করলে ২-৩ বৎসরের মধ্যে ঘোলাত্ব স্থায়ীভাবে দূর হবে। লাল অম্ল মাটির কারণে পানির ঘোলাত্ব সৃষ্টি হলে পানির পি এইচ মাত্রা ৬.৫ না হওয়া পর্যন্ত ঘন ঘন পানি পরিবর্তন করতে হবে। তারপর চুন ও সার দিতে হবে। চাষকালীন সময়ে কখনই পুকুরের পানি বেড় করে দিয়ে শুকানো যাবে না। ক্ষুদ্র উদ্ভিদকণা ঘটিত ঘোলাত্ব সৃষ্টি হলে পানি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। পানি পরিবর্তন সম্ভব না হলে মাছের খাদ্য কমিয়ে দিতে হবে। পুকুরে শতাংশ প্রতি ৮০০-১২০০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করতে হবে।

১২) পুকুরে পানি চোয়ানো

নদী সন্নিকটস্থ পলিময় বালিযুক্ত মাটির পুকুরে পানি ধারণ ক্ষমতা খুবই কম। তাই এসব পুকুরে শুষ্ক মৌসুমে পানি চোয়ায়ে বেড়িয়ে যায়। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুকুর শুকিয়ে যায়। এসব পুকুরে মাটির কণা অনেক মোটা থাকাতে কণাগুলোর অন্তবর্তী সংযোগ স্থলে ক্ষুদ্র ছিদ্র থেকে যায়। এ ছিদ্র পথে পানি বেড়িয়ে যায়।

নিয়ন্ত্রণের উপায় ঃ পুকুরে জৈব সার বেশি ব্যবহার করতে হবে। জৈব সার বেশি ব্যবহারের ফলে ২-৩ বৎসরের মধ্যে পানি চোয়ানো বন্ধ হবে। তাছাড়া পুকুর প্রস্তুতির সময় পুকুরের তলদেশে ১৫-২০ সেন্টিমিটারের এটেল মাটির স্তর দিলে পানি চোয়ানো বন্ধ হবে।

১৩) বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন

বর্ষাকালে অতি বৃষ্টির ফলে পুকুরে পানির পরিমাণ বেড়ে গিয়ে পাড় উপচিয়ে মাছ বেড়িয়ে যেতে পারে। তাই পুকুর প্রস্তুতির সময় পুকুর পাড়ে ১ ফুট গভীরতায় বাঁশের চোঙ্গা অথবা প্লাষ্টিকের পাইপ বসিয়ে দিতে হবে যাতে বৃষ্টির সময় অতিরিক্ত পানি স্বাভাবিকভাবেই পুকুর হতে নিষ্কাশন করা যায়। তাছাড়া বন্যার সময় পুকুর পাড় প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে আগে থেকেই বাঁশের বানা দ্বারা পুকুর পাড় ঘেরে দিতে হবে যাতে প্লাবনের সময় পুকুরের মাছ বের হয়ে যেতে না পারে।

১৪) মাছের রোগ বালাই

জীব মাত্রই রোগ ব্যধি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। অন্যসব জীবের ন্যায় মাছ ও বিভিন্নভাবে রোগে আক্রান্ত হয়। পুকুরে মাছ সাধারনতঃ পরজীবি জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হয়। এছাড়া খাদ্যাভাব বা অনপোযোগী খাদ্য, অক্সিজেনের অভাব, অতিরিক্ত তাপমাত্রা বা ঠান্ডা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মাছের নানাবিধ রোগ হয়।

মাছের খাবার, উপযুক্ত পরিবেশ ও নিরাপদ আবাস নিশ্চিত করা সম্ভব হলে রোগ বালাই কম হবে। এসব নিশ্চিত করতে পুকুর শুকানো ও চুন প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবেশ ঠিক রাখা এবং সুস্থ্য ও সবল পোনা নির্ধারিত সংখ্যায় ও আকারে মজুদ করাই রোগ প্রতিরোধের উপায়। কতিপয় সতকর্তামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে পুকুরে মাছের রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। এ জন্য নিম্নলিখিত সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

১) পুকুরের পরিবেশ ও পানির গুনাগুন ঠিক রাখা
২) পুকুর জলজ আগাছা মুক্ত রাখা
৩) পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পড়ার ব্যবস্থা করা
৪) পুকুর হতে অনাকাঙ্খিত প্রাণি অপসারণ করা
৫) পুকুরের অতিরিক্ত কাদা সরিয়ে ফেলা
৬) সম্ভব হলে ২/৩ বছর অন্তর পুকুর শুকিয়ে ফেলা
৭) উন্নত জাতের সুস্থ্য, সবল ও সঠিক সংখ্যক বড় পোনা মজুদ করা
৮) পুকুরে পরিমাণ মত চুন প্রয়োগ করা
৯) পুকুরে পরিমাণ মত খাদ্য ও সার সময়মত সরবরাহ করা
১০) মাঝে মাঝে জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা
১১) নিয়মিত হররা টেনে পুকুরের তলদেশের বিষাক্ত গ্যাস অপসারণ করা
১২) পুকুরে রোগ জীবানু বাহক পাখি বসতে না দেওয়া
১৩) অন্য জলাশয়ে ব্যবহৃত জাল শোধন না করে ব্যবহার না করা
১৪) গবাদি পশু গোছল ও রোগাক্রান্ত মাছ পুকুরে ধোঁয়া থেকে বিরত থাকা

এর পরেও যদি মাছ রোগাক্রান্ত হয় তাহলে মৎস্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্লাবনভূমির পরিমাণ, জনগোষ্ঠীর ধরন, মৎস্য চাষের উপযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে প্রেক্ষাপট তথ্য (Background Information) সংগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ। এসব তথ্যসমূহ সরকারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বিভাগে, বিভিন্ন এনজিও, দাতা ও গবেষণা সংস্থার কাছে পাওয়া যেতে পারে। তবে উদ্যোক্তাগণ প্রত্যক্ষভাবে কমিউনিটির বাসিন্দা হলে তাদের কাছেই এ বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। এসব তথ্যের ভিত্তিতে প্রারম্ভিকভাবে প্লাবনভূমি চিহ্নিত হওয়ার পর আরো বিস্তারিত তথ্য প্রয়োজন। এ পর্যায়ে লক্ষীভূত এলাকার জনসংখ্যা, প্রকল্প বাস্তবায়নে জনগণের প্রণোদনা (Motivation), প্লাবনভূমির সর্বমোট জমির পরিমাণ, জমির মালিকদের সংখ্যা, প্লাবনভূমির আভ্যন্তরিণ ডোবা, জলাশয়, প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত/ আহরিত মৎস্যের বিবরণ, জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা নের্তৃবৃন্দ, ফসলের বিবরণ, সংশ্লিষ্ট জেলে পরিবার, প্লাবনভূমি থেকে তাদের বার্ষিক আয়, প্লাবনভূমি ও জলাভূমিতে বিভিন্ন ঋতুতে জল ও বন্যা পরিস্থিতি, মাটির বর্ণনা, নিকটবর্তী এলাকা ও শহরের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে যেমন- ঘরে ঘরে বা সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে প্রশ্নমালা পদ্ধতি-র (Questionnire) মাধ্যমে, গ্রাম ও জনগোষ্ঠী ভিত্তিক পিআরএ (Participatory Rural Apprisal) কর্মসূচী, সাধারণ জনসভা, সর্বোপরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত হতে পারে। সংগৃহিত তথ্যের বিশ্লেষণ করে প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্যোক্তা সংস্থার সামর্থ্য ও দক্ষতা বিবেচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রেক্ষাপট তথ্য সংগ্রহ ও চাহিদা নিরূপণের ক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন, ব্যাপক গবেষণা অনেক সময়ই নিস্প্রয়োজন। বরং মৎস্য চাষের কারিগরী সম্ভাব্যতা যাচাই ও জনগণের আগ্রহ-নিরাগ্রহ নিরূপণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে পিআরএ অত্যন্ত কার্যকর একটি পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

পরিকল্পনা প্রণয়ন

জনগণের চাহিদা ও বাস্তবতা উভয় বিষয়কে মূল্যায়ন করে জনঅংশগ্রহনের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে। স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে- প্রকল্প বাস্তবায়নে কত টাকা লাগবে, টাকা সংগ্রহের পদ্ধতি কি হবে, কিভাবে সব টাকা ব্যাংকে জমা হবে এবং সবার কাছে গ্রহনযোগ্য কারা কারা এই টাকার ব্যাংক এ্যাকাউন্টের দায়িত্ব নেবে, প্রকল্পটির আইনগত ভিত্তি কি হবে, হিসাব নিকাশের স্বচ্ছতা, দক্ষ ব্যবস্থাপনা, প্রকল্পের লভ্যাংশ বন্টন পদ্ধতি, গণমত প্রকাশের ব্যবস্থা এবং পরিচালকদের দায়বদ্ধ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় জনশক্তি ও দক্ষতার সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং বহিঃসাহায্যের প্রাপ্তির সম্ভাবনা, পদ্ধতিসমূহ স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনায় বিবেচনা করতে হবে। সর্বোপরি. প্রকল্পের লোকজনকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষিত করে তোলার পরিকল্পনাও গুরুত্বপূর্ণ।

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রথমতঃ বিবেচনা করতে হবে, প্রকল্পটি ভবিষ্যতে কিভাবে তার কার্যক্রম সম্প্রসারণ করবে এবং প্রকল্পের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রক্রিয়ার চর্চা কিভাবে নিশ্চিত করা যাবে। এসব বিষয় অবশ্যই স্বল্পসময়ে নিশ্চিত করা যাবে না, ধাপে ধাপে এর উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা করা যেতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আরো বিবেচনা করতে হবে- কমিউনিটিতে বিদ্যমান কিংবা ভবিষ্যতে গড়ে উঠা অন্যান্য মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্পসমূহকে কিভাবে সহায়তা করা হবে। কেননা, কমিউনিটি জুড়ে সমাজ ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমের ব্যাপক সম্প্রসারন বা রেপ্লিকেশন মূল প্রকল্পকে আরো শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভে সহায়তা করবে। সর্বোপরি- কমিউনিটির অন্যান্য উন্নয়ন ইস্যুসমূহ বিশেষতঃ ভূমিহীনদের ক্ষমতায়ন, নারীর অধিকার বাস্তবায়ন ও ক্ষমতায়ন, জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস, প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুনিশ্চিতকরণ ইত্যাদি ইস্যুসমূহ মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করার পরিকল্পনা করা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, উন্নয়নের গুরুত্বপূনর্ণ ইস্যুসমূহে আলোকপাত না হলে কোন এলাকার জনগণের যতোই অর্থনৈতিক উন্নয়ন হোক না কেন, তা থেকে সমাজের সব শ্রেণির মানুষ সমভাবে সুফল ভোগের সুযোগ (Access) পায় না।

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সাথে স্থানীয় এনজিও-গুলো ঘনিষ্ঠ কাজ করে। সুতরাং এসব এনজিও-গুলো যদি সমাজভিত্তিক মৎস্য উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে, তবে পাশাপাশি উন্নয়নের বিভিন্ন ইস্যুতে পরিকল্পনা গ্রহণ তাদের পক্ষে সম্ভব। তবে অনেক বিষয়ে ব্যাপক পরিকল্পনা নেয়া অধিকাংশ সংস্থার পক্ষে একা একা সম্ভব নয়, সে ক্ষেত্রে কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত বিবিধ সহায়তাসমূহ কিভাবে সরকারি-বেসরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে কমিউনিটি পর্যায়ে আনা সম্ভব, এনজিও বা সিবিও-গুলো সে বিষয়ে পরিকল্পনা করতে পারে।

সচেতনতা ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী

যেহেতু মানুষের কাম্য উন্নয়ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিবাচক পরিবর্তনসমূহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, সুতরাং সম্ভাব্য প্রকল্প এ ক্ষেত্রে কি অবদান রাখতে পারে এটা পরিস্কারভাবে জনগণের সামনে উপস্থাপন করা সম্ভব হলে দ্রুত গণসচেতনতা সৃষ্টি সম্ভব। জনগণকে যদি পরিস্কার বোঝানো যায় যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি তার অন্যান্য সামাজিক উন্নয়নও এই প্রক্রিয়ায় হবে বা ব্যক্তিগত মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে, তবে অংশ গহণে তাদের আগ্রহ

কাঠামো শক্তিশালীকরণের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে ঃ

- **আইনগত ভিত্তি স্থাপন ঃ** প্রকল্পের আইনগত ভিত্তি আগে থেকেই নির্ধারণ করে এগোতে হবে। প্রকল্পকে কোম্পানি কিংবা সমিতি আইনে অথবা কোন প্রক্রিয়ায় নিবন্ধিত করা হবে, সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কার্যক্রম শুরুর আগেই নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পাদন করে নেয়া বাঞ্চনীয়।
- **দক্ষ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নিশ্চিতকরণ ঃ** প্রকল্পটি কারা পরিচালনা করবেন, পরিচালকগণ কিভাবে, কতো সময়ের জন্য নির্বাচিত হবেন এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে। নিয়মাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রকল্প পরিচালনা, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, হিসাব ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে ধারাবাহিকভাবে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পের ক্রয়-বিক্রয়, বাজারজাতকরণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন সাব-কমিটি গঠনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনাকে কার্যকরী করে তোলা যায়।
- **স্থানীয়ভাবে পুঁজিগঠন ঃ** স্থানীয়ভাবে পুঁজিগঠন হলে আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনের পাশাপাশি প্রকল্পে সামাজিক অংশগ্রহন বৃদ্ধি পাবে। পুজিঁগঠন প্রক্রিয়া হিসেবে শেয়ার পদ্ধতির মাধ্যমে মূলধন গঠন করা যেতে পারে। কখনো কখনো প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু মূলধনের সঙ্কট দেখা যেতে পাবে, এ ধরনের প্রয়োজনীয়তায় উদ্যোক্তা সংগঠন সহযোগীতা করতে পারেন।
- **অংশীদারীত্বে সমতা ঃ** প্রভাবশালীদের হাত থেকে প্রকল্পকে প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য অংশীদারীত্বে ভারসাম্য রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ। একই ব্যক্তি যেন খুব বেশী অংশের অধিকারী না হন এবং সবাই যেন অংশীদারীত্ব পেয়ে থাকেন, সে অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। দুঃস্থ ও সাধারণ মানুষদের মধ্যে যাদের এককালীন জমাদানের মাধ্যমে বিনিয়োগের ক্ষমতা নেই, তাদের জন্য কিস্তি সুবিধা দেয়া যেতে পারে।
- **কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ঃ** প্রকল্পের কর্মী, কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বৃদ্ধি স্থায়ীত্বশীল সাংগঠনিক কাঠামোর অন্যতম শর্ত। কর্মীদের আধুনিক প্রযুক্তি ও কলাকৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে। প্লাবনভূমিতে মৎস্য চাষ যেহেতু অনেকাংশে একটি ভিন্নতর বিষয় সুতরাং এ বিষয়েও ভিন্ন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।
- **জবাবদিহীতা ও স্বচ্ছতার পরিবেশ সৃষ্টি ঃ** জনগণের ভয়ভীতি, সন্দেহ ইত্যাদি দূর করার জন্য স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতামূলক পদ্ধতি নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্পের হিসাব নিকাশ এবং লাভক্ষতি জনসমক্ষে তুলে ধরার নিয়মনীতি থাকতে হবে। প্রতি বছর বার্ষিক সাধারন সভার মাধ্যমে জনগণের কাছে প্রকল্প পরিচালকগণ এ জবাবদিহীতা করতে পারেন। জবাবদিহীতামূলক পদ্ধতির এই ভিত্তি স্থাপন এবং তার ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকা প্রয়োজন।

শেষ কথা

যে কোন কমিউনিটিতে একটি প্রকল্প গড়ে তুলতে পারলে বৃহৎ জনগোষ্ঠিকে যেমন উদ্দীপ্ত করে তোলা যায়, তেমনি তাদের উদ্দীপনাকে ধরে রাখার মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যেই এর ব্যাপক রেপ্লিকেশনও সম্ভব। গ্রামীন জনগোষ্ঠির প্রায় ৭০ শতাংশ কোন না কোনভাবে মৎস্য কার্যক্রমের সাথে জড়িত (চাষ, উৎপাদন, বিপণন, শ্রম প্রদান ইত্যাদি), সুতরাং এই জনগোষ্ঠিকে সমাজভিত্তিক মৎস্য উন্নয়ন কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করে তোলা এবং কার্যক্রম শুরু করা খুব কঠিন কিছু নয়। সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জনগণ খুব দ্রুত আলোড়িত হয়, আবার এর সামান্য ব্যর্থতায় একই রকমভাবে হতাশও হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং গ্রামীন প্রেক্ষাপটে সমাজভিত্তিক পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করে তোলা ও তা ধরে রাখার লক্ষ্যে দক্ষ ও শক্তিশালী উদ্যোক্তা সংগঠনকে অন্তত একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত থাকা গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের সাথে সরকারি মৎস্য বিভাগকেও সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে যে কোন কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বিবেচনা করেই সঠিক সময়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। জনগণের মধ্যে বিভিন্ন সময় সামান্য কারনে সংঘাত দেখা দিতে পারে, যা একদিকে যেমন অনেক বড় উদ্যোগ-কে বাঁধা দিতে পারে, তেমনি একটি সফল প্রকল্পও বন্ধ হয়ে যেতে পারে এসব কারণে। নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণই এসব সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়।

৩। ছড়া জাতীয় জলাশয়ে মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা ঃ

মাছের প্রাকৃতিক আধার হিসেবে 'ছড়া' জাতীয় জলাশয়গুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে আসছে। বৃহত্তর রংপুরে অসংখ্য মৎস্যজীবি পরিবার এবং স্থানীয় জনসাধারণ ছড়াগুলোর উপর নির্ভরশীল। ছড়া জাতীয় জলাশয়গুলো শুধুমাত্র লীজ দিয়ে দেয়ার কারণে সেখানে লীজ গ্রহীতা কর্তৃক শুধুমাত্র মৎস্য আহরণ চালু ছিল। ফলে সব প্রজাতির মাছই ধৃত হতো। এভাবে ধৃত হওয়ার কারণে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট মৎস্য উৎপাদন হ্রাস পায় এবং ছড়া জাতীয় জলাশয়গুলোতে প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সহায়ক মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ব্যবস্থাপনার কারণ নিম্নরূপ ঃ

ক) প্রবহমান নদীর সাথে বর্ষাকালে সংযোগ থাকার কারণে রুই জাতীয় মাছসহ অন্যান্য প্রজাতির মাছ 'ছড়া' জাতীয় জলাশয়ে আশ্রয়ের জন্য ঢোকে।

খ) ছড়া জাতীয় জলাশয়গুলো তুলনামূলকভাবে বেশী গভীর হওয়ার কারণে রুই জাতীয় মাছসহ প্রায় ৫৪ প্রজাতির মাছের প্রাপ্যতা নিরুপন করা হয়েছে।

গ) প্রচুর জলজ উদ্ভিদ ও আগাছা সৃষ্টি হওয়ার কারণে প্রচুর প্লাংকটনের অবস্থান মাছের খাবার হিসাবে জলাশয়গুলোতে সহজলভ্য।

বিল জাতীয় জলাশয়ে এবং ছড়া জাতীয় জলাশয়ে প্রাকৃতিক মাছের প্রাপ্যতা ঃ বিল ও ছড়া জাতীয় জলাশয়গুলো প্রাকৃতিগতভাবে প্রাপ্যতার ক্ষুদ্র তুলনামূলক বিররণী সারণী- ১ এ তুলে ধরা হলো।

সারণী- ১

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রাপ্যতার পরিমাণ (হেক্টর প্রতি)		সূত্র
		ছড়া	বিল	
১।	রুই জাতীয় মাছ	১৮ কেজি	০.০৮ কেজি	২০০০ সালের কুড়িগ্রাম জেলার প্রকল্প পূর্ব Bench Mark সার্ভে অনুসরনে।
২।	শোল জাতীয় মাছ	৪৫ কেজি	৪২ কেজি	
৩।	পুঁটি জাতীয় মাছ	৭০ কেজি	৬৫ কেজি	
৪।	টেংরা জাতীয় মাছ	৭০ কেজি	৪০ কেজি	
৫।	চাপিলা	১১০ কেজি	০৭ কেজি	
৬।	কই, শিং,	১৮ কেজি	১৫ কেজি	
৭।	অন্যান্য মাছ ছোট মাছ	৩৭ কেজি	২০ কেজি	
	মোট =	৩৬৮ কেজি	১৮৯.০৮ কেজি	

তুলনামূলক চিত্র দেখে বুঝা যায় ছড়া জাতীয় জলাশয়গুলোতে মাছের প্রাপ্যতা বিল জাতীয় জলাশয়ের প্রায় দ্বিগুণ। হেক্টর প্রতি ছড়ায় মাছের উৎপাদন ৩৬৮ কেজি এবং বিলে উৎপাদন ১৮৯.০৮ কেজি। অন্যদিকে মৎস্য অধিদপ্তরের রিসোর্স সার্ভের তথ্য মতে বাওড় জাতীয় জলাশয়ে হেঃ প্রতি উৎপাদন হার ৭০৯ কেজি এবং বিল জাতীয় জলাশয়ের উৎপাদন হার হেঃ প্রতি ৬৬৭ কেজি। উপরোক্ত তথ্য প্রমাণ করে যে, ছড়া জাতীয় জলাশয়গুলো প্রকৃতিগত মৎস্যপ্রাপ্তির স্বাভাবিক ও অন্যতম প্রধান উৎস। এর কারণ সম্ভবত বর্ষাকালে নদীর সাথে ছড়ার যোগসূত্র স্থাপন এবং লক্ষ্যণীয় বিষয় কোন কোন ছড়াতে শুধু একটি মাত্র প্রজাতির উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণ বেশি। কুড়িগ্রাম অঞ্চলের ৩টি ছড়াতে হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ১৬০ কেজি পর্যন্ত শুধুমাত্র চাপিলা মাছ পাওয়া গেছে।

ছড়ার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বর্ষাকাল ব্যতিত (৬ মাস) বাকী সময়টুকু বদ্ধ জলাশয়ে রুপান্তরিত হওয়া। পরিকল্পিত রুই জাতীয় মাছ চাষে উদ্যোগী হওয়ার আগে ছড়া ব্যবস্থাপনার সমস্যাগুলো আগে জানা প্রয়োজন।

ক) সমস্যাবলী ঃ

১) বর্ষায় পার্শ্ববর্তী প্রবাহমান নদীর সাথে সংযোগ ঘটার কারনে অবমুক্তকৃত পোনা বেড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

২) বর্ষাকালে নদীর সাথে যোগাযোগ থাকার কারণে এবং পার্শ্ববতী বিলের সাথে যোগাযোগ ঘটার কারণে প্রচুর অন্য প্রজাতির মাছ ছড়াতে প্রবেশ করে।

৩) বন্যা জনিত সমস্যা।

৪) ছড়ার খাস অংশে জেলা প্রশাসন কর্তৃক অবৈধ বন্দোবস্ত দেয়ার কারনে সামাজিক সংঘাতের সৃষ্টি।

৫) মধ্যস্বত্বভোগীদের কোন না কোন ভাবে অনুপ্রবেশের চেষ্টা।

খ) সমাধান ঃ

১) বর্ষাকাল আসার পূর্বেই বানা দিয়ে বা আয়রন স্ক্রীন নেট দিয়ে পোনার নির্গমন পথ বন্ধ করা। আয়রণ স্ক্রীন নেটের মেস সাইজ ৪.৭ সেমি হলে ভাল

বাংলাদেশে মৎস্য প্রজাতির অবস্থা

নাসিরউদ্দিন মোঃ হুমায়ুন
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

১। ভূমিকা ঃ

মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান পৃথিবীর অন্যতম দেশগুলোর মধ্যে একটি। অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদনে চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়ার পরই বাংলাদেশের অবস্থান। এ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মৎস্য সেক্টরটি সবসময়ই সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে তথা জিডিপিতে মৎস্য উপখাতের অবদান ৫.৯% যা কৃষি খাতে উৎপাদিত মোট মূল্যের প্রায় ২৩% (১৯৯৯-২০০০)। এছাড়া এ সেক্টরের সাথে ১২ লক্ষ লোক সার্বক্ষণিক এবং প্রায় ১.২০ কোটি লোক পরোক্ষভাবে জড়িত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে। বাংলাদেশের জলসম্পদ এতটাই বিস্তৃত যে দেশের প্রায় ৪.৯ মিলিয়ন হেক্টর অর্থাৎ প্রায় ৩৪% এলাকা বছরের প্রায় ৬-৮ মাস জলমগ্ন থাকে। এ দেশের ভূ-প্রকৃতি এবং জলবায়ু এ বিশাল জলসম্পদকে বিপুল সংখ্যক মৎস্য প্রজাতির বিচিত্র এক আবাসনের সুযোগ করে দিয়েছে।

২। দেশের বিভিন্ন উৎসসমূহে মৎস্য প্রজাতির বিস্তৃতি ঃ

২.১ অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য প্রজাতি ঃ একসময় বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় হতেই মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ৯০% যোগান আসত (১৯৬০-৭০)। বাংলাদেশে নদী এবং মোহনাঞ্চল ১০.৩২ লক্ষ হেক্টর, বিল এলাকা ১০.৪১ লক্ষ হেক্টর, কাপ্তাই হ্রদ ৬৮,৮০০ হেক্টর, এবং বিস্তীর্ণ প্লাবন ভূমি প্রায় ২৯ লক্ষ হেক্টর এর উন্মুক্ত জলাশয়ে বিপুল সংখ্যক মৎস্য প্রজাতির বাস। জলাশয়ের প্রতিবেশ, প্রকৃতি এবং পরিবেশের ভৌত রাসায়নিক এবং জৈবিক গুণাগুণের উপর নির্ভর করে মৎস্যকুলের প্রাচুর্য্যতা এবং প্রজাতির বিনাশ পরিদৃষ্ট হয়। বাংলাদেশের স্বাদুপানির উন্মুক্ত জলাশয়ে ১৩ পর্বে, ৫৫ গোত্রে, ১৪৫ গণে ২৬০ প্রজাতির মাছ (Rahman, 1989) এবং ২৫ প্রজাতির চিংড়ি সনাক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত প্রায় ০.৫৮ লক্ষ হেঃ সুন্দরবন অঞ্চলের প্রায় ০.১৮ লক্ষ হেঃ বিস্তৃত নদী, খাল এবং অন্যান্য জলাশয়ে বাণিজ্যিক গুরুত্ব সম্পন্ন ১২০ প্রজাতির স্বাদু ও সামুদ্রিক মাছের বাস।

২.২ সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি ঃ বাংলাদেশের ৭১০ কিলোমিটার তটরেখার কাছাকাছি বেইস লাইন থেকে সাগরে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত প্রায় ১৬৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বিস্তৃত একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের সামুদ্রিক জলসম্পদ রয়েছে। নানা বৈচিত্র্যময় প্রজাতি সমভিব্যহারে এ বিশাল জলরাশি সমৃদ্ধ। এ পর্যন্ত সামুদ্রিক জলাশয়ে ৪৭৫ প্রজাতির মাছ (Hossain,1979) এবং ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি সনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬৫ প্রজাতির মাছ এবং ৮ প্রজাতির চিংড়ি অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

২.৩ বদ্ধ জলাশয়ের মৎস্য প্রজাতি ঃ বর্ধিত জনগোষ্ঠীর প্রাণীজ আমিষের চাহিদা মিটানোর জন্য বদ্ধ জলাশয়ে বিশেষ করে পুকুর, দীঘি, বরোপিট, বাওড়, চিংড়ি খামারঘের ইত্যাদির প্রায় ২.৯১ লক্ষ হেক্টর জলাশয়ে চাষ ভিত্তিক মৎস্য উৎপাদন কার্যক্রম দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। বদ্ধ জলাশয়ে দেশীয় প্রজাতির রুই জাতীয় মাছ (কার্প) ছাড়াও বিদেশী ১২ প্রজাতির মাছ চাষ করা হচ্ছে (সারণী-১)। কৌলিতাত্ত্বিক গুণাবলীর উন্নয়ন ঘটিয়ে উন্নত মৎস্য প্রজাতি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক একলিঙ্গ রাজপুঁটি মাছ, রুই মাছের উন্নত ক্লোন উৎপাদন, হাইব্রিড মাগুর উৎপাদন, লাল তেলাপিয়া, গিফট তেলাপিয়া ইত্যাদির উপর পরীক্ষামূলক কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

৩। সংকটাপন্ন ও বিপন্ন প্রায় মৎস্য প্রজাতি ঃ

মনুষ্যসৃষ্ট এবং প্রকৃতিগত বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলে মৎস্য প্রজাতির বৈচিত্র্যতার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিদৃষ্ট হচ্ছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে বিপন্ন প্রায় প্রজাতির মাছ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সরকারী পরিসংখ্যান না থাকলেও IUCN (১৯৯৭) এর এক সমীক্ষায় এ পর্যন্ত ৫৮ প্রজাতির মাছকে বিপন্ন বা সংকটাপন্ন প্রজাতি হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে (সারণী-২)। টাঙ্গুরিয়া হাওড়ের উপর এক সমীক্ষায় (১৯৯৭) দেখা গেছে, উক্ত হাওড়ের ১৪১ প্রজাতির মাছের মধ্যে ৫৫ প্রজাতির মাছই বিপন্ন প্রায়, যার মধ্যে ৩ প্রজাতির মাছ (*Channa barca; Labeo boggut; Labeo nandina*) বিলুপ্ত বলে ধারণা করা হচ্ছে। চান্দা বিলের উপর এক সমীক্ষা প্রতিবেদনে (১৯৯৮) এ বিলে ৬০ প্রজাতির মাছ এবং ৪ প্রজাতির চিংড়ির মধ্যে স্থায়ীভাবে ৩ প্রজাতির মাছ *(Puntius sarana; Rasbora elonga; Ophisternon bengalensis)* বিলুপ্ত হয়ে গেছে উল্লেখ আছে। এভাবে দেশের অন্যান্য জলাশয়ের উপর সমীক্ষা পরিচালিত হলে

এবং চিংড়ি চাষের ব্যাপকতা সম্প্রসারিত হওয়ায় চকোরিয়া সুন্দরবন এলাকার পারাবন সংকুচিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হচ্ছে। সামুদ্রিক ও উপকুলীয় বহু প্রজাতির মাছ ও চিংড়ির জন্য উৎকৃষ্ট লালন ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত এই পারাবন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করে মৎস্য প্রজাতি কুলের বংশ বিস্তার ও বৃদ্ধির জন্য অনুকূল প্রতিবেশ ও পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

৫.৪ বিদেশী মাছের চাষ সম্প্রসারণ ঃ বাংলাদেশের আবহাওয়ায় যে কোন বিদেশী মাছ বাণিজ্যিক ভাবে চাষের পূর্বে সংগনিরোধ ব্যবস্থায় এদের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। আমদানীকৃত মাছে সংক্রামক রোগের জীবাণু বাহিত হয়ে দেশীয় প্রজাতির মাছের জন্য ব্যাপক ক্ষতির কারণ হতে পারে। যেমন ১৯৯৪ সালে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত চিংড়ি পোনার সাথে প্রবেশকৃত চায়না ভাইরাস চাষকৃত চিংড়ি খামারে ভাইরাস রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়ে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে।

৫.৫ শিল্প বর্জ্য নিক্ষেপণ রোধ ঃ পরিশোধন ব্যতীত বিষাক্ত শিল্প বর্জ্য নদীতে বা অন্যান্য জলাশয়ে নিক্ষেপণ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। এ ব্যাপারে পরিবেশ অধিদপ্তরের শিল্প আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

৫.৬ কৃষি জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ঃ কৃষি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জমিতে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার নিশ্চিত করে মৎস্য প্রজাতির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। এক হিসাব মতে ১৯৭৭ এর তুলনায় বর্তমানে প্রায় ৪০০% অধিক হারে এ ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

৫.৭ জলমহালের জৈবিক উৎপাদন ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ঃ ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল আর্টিক্যাল ১৮৩ অনুযায়ী দেশের জলমহাল সমূহের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ভূমি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত আছে- যা মূলত রাজস্ব ভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি মাছের বৈচিত্র্যময় প্রজাতি সংরক্ষণের জন্য জলমহাল সমূহ জৈবিক ব্যবস্থাপনার অধীনে আনা জরুরী।

৫.৮ মাছের কৌলিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ ঃ ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তা এবং মৎস্য প্রজাতির বিপন্ন প্রায় বা বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য সংকটাপন্ন মৎস্য প্রজাতির জার্ম প্লাজম সংগ্রহ পূর্বক ক্রায়োপ্রিজারভেশন করতে হবে। এ ব্যাপারে মাৎস্য গবেষণা ইন্সটিট্যুটকে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মৎস্য প্রজাতির বৈচিত্র্যতা সংরক্ষণের জন্য পানি সম্পদ ব্যবহারের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় এবং পরস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

সারণী-১ ঃ বাংলাদেশে চাষকৃত/চাষযোগ্য বিদেশী মৎস্য প্রজাতি

ক্রমিক	প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম	প্রচলিত নাম	সংগ্রহ		প্রাকৃতিক আবাস
			উৎস	বছর	
১।	*Oreochromis mossambica*	তেলাপিয়া	থাইল্যান্ড	১৯৫৪	আফ্রিকা
২।	*Oreochromis niloticus*	নাইলোটিকা	থাইল্যান্ড	১৯৭৪	আফ্রিকা
৩।	*Hypophthalmichthys molitrix*	সিলভার কার্প	হংকং	১৯৬৯	চীন
৪।	*Ctenopharyngodon idella*	গ্রাস কার্প	হংকং	১৯৬৬	চীন
৫।	*Aristichthys nobilis*	বিগহেড	নেপাল	১৯৮১	চীন
৬।	*Mylopharyngodon piceus*	ব্লাক কার্প	চীন	১৯৮৩	চীন
৭।	*Cyprinus carpio var. communis*	কমন কার্প	হাঙ্গেরী	১৯৬০	টেম্পারেট এশিয়া, ইউরোপ
৮।	*Cyprinus carpio var. specularis*	মিরর কার্প	নেপাল	১৯৭৯	টেম্পারেট এশিয়া, ইউরোপ
৯।	*Pangasius hypopthalmus*	পাংগাস	থাইল্যান্ড	১৯৯০	ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া
১০।	*Puntius gonionotus*	রাজপুঁটি	থাইল্যান্ড	১৯৭৭	থাইল্যান্ড
১১।	*Clarias gariepinus*	আফ্রিকান মাগুর	থাইল্যান্ড	১৯৯০	আফ্রিকা
১২।	*Trichogaster pectoralis*	গোরামী	সিঙ্গাপুর	১৯৫২	থাইল্যান্ড

Drm¨ t Introduction of Exotic Fishes in Bangladesh (1985) and other reports

চলন বিলে মৎস্য সম্পদ হ্রাস-প্রাপ্তির কারণ পর্যালোচনা

মোঃ সিরাজুল করিম
মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী

১. ভূমিকা

বাংলাদেশ নদী-নালা, খাল-বিল ও প্লাবন ভূমি সমৃদ্ধ এবং এর মধ্যে চলন বিল বাংলাদেশর বৃহত্তম বিল। চলন বিলের মৎস্য সম্পদ এক সময় প্রবাদ বাক্যের মত সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্য বহুল ছিলু। চলন বিলের মাছের প্রাচুর্যতা যেমন ছিল মাছের স্বাদও ছিল অনন্য। প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট কারণে আজ চলন বিল মৎস্য সম্পদের ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। তাই চলন বিলের মৎস্য সম্পদ হ্রাসের বিষয়টির সূত্র ধরেই মৎস্য সম্পদ হ্রাসের কারণ পর্যালোচনা বিষয়ক চলতি নিবন্ধের সূত্রপাত।

চলন বিল এলাকার প্রায় ৭৫টি মৎস্য প্রজাতির মাধ্যমে ২০ হাজার হেক্টর জলাশয়ের যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা গেলে তা থেকে বার্ষিক ২০ হাজার মেট্রিক টন এবং ৫০ হাজার হেক্টর প্লাবন ভূমি থেকে ২৫ হাজার মেট্রিক টন মাছের উৎপাদন আসতে পারে। বর্তমানের চলন বিল এলাকার স্থায়ী জলাশয় থেকে প্রায় ৬ হাজার মেট্রিক টন এবং প্লাবন ভূমি এলাকা থেকে ৫ হাজার মেট্রিক টন মাছের উৎপাদন আসছে। সম্ভাব্যতা বিচারে বর্তমান উৎপাদন প্রায় ৭৫ শতাংশ কম এবং ১৯৮২ সনের উৎপাদন থেকে বর্তমানে উৎপাদন প্রায় ৫৪ শতাংশ কম। চলতি নিবন্ধে মাছের এহেন উৎপাদন হ্রাস প্রপ্তির কারণ চিহ্নিত ও পর্যালোচনার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সহনশীল উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণের একটা ভিত্তি হিসেবে কাজে লাগতে পারে।

২. পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা পদ্ধতি

চলন বিলে মৎস্য সম্পদ হ্রাস প্রাপ্তির কারণ পর্যালোচনার বিষয়টি প্রধানত মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতেই সম্পাদিত। সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য, স্থানীয় কৃষি অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, বিএডিসি প্রতিনিধি, পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রতিনিধি এবং মৎস্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীর মতামত গ্রহণ করা হয় এবং একই সাথে একটি নির্ধারিত ছকে ৪০ উর্ধ বয়সের ১০ জন জনপ্রতিনিধি, ১০ জন কৃষক এবং ১১ জন মৎসজীবির সাক্ষাৎকার তথ্য জরিপ করা হয়। ছক পত্রে কৃষি ফসলের ধরন, রোগবালাই দমনে কীটনাশকের ব্যবহার, মৎস্য প্রজাতি, মাছ আহরণ ও বাজারতাজকরণ, আহরিত মাছের পরিমাণ, জলাশয়ের পানির স্থিতি, কৃষিতে সেচ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে ১৯৮২, ১৯৯২ এবং ২০০২ সালের প্রকৃত অবস্থা তথ্য সংগ্রেহের ব্যবস্থা ছিল। একই সাথে মৎস্য সম্পদ হ্রাসের কারণ ও বৃদ্ধির উপায় সম্পর্কেও মতামত গ্রহণ করা হয়।

৩. চলন বিল এলাকার সংশ্লিষ্ট তথ্য

চলন বিল এলাকাটি পাবনা জেলার চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া ও ফরিদপুর উপজেলার অংশ; সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ ও উল্লাপাড়ার অংশ এবং নাটোর জেলার সিংগা ও গুরুদাসপুর উপজেলার অংশ নিয়ে বিস্তৃত।

৩.১ স্থায়ী সম্পদ সংক্রান্ত

(১) সরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন স্থায়ী জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ২০ হাজার হেক্টর, প্লাবন ভূমির পরিমাণ প্রায় ৫০ হাজার হেক্টর এবং পুকুর ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের সেচ নালা এলাকা প্রায় ৩ হাজার হেক্টর।

(২) পাবনা জেলাধীন ভাঙ্গুড়া, চাটমোহর ও ফরিদপুরের চলন বিল এলাকার ৩১,৫১৫ জন কৃষকের কৃষি জমির পরিমাণ ২৮,২২৭ হেক্টর। সিরাজগঞ্জ ও নাটোরের চলন বিল এলাকার কৃষক ও কৃষি জমির পরিমাণ নিয়ে পাবনা, নাটোর ও সিরাজগঞ্জে সর্বমোট ১ লক্ষ ৭৫ হাজার কৃষকের কৃষি জমির পরিমাণ প্রায় ৮২ হাজার হেক্টর।

(৩) চলন বিল এলাকাধীন বসত বাড়ি, হাট বাজার ও রাস্তাঘাটের পরিমাণ প্রায় ২০ হাজার হেক্টর।

(৪) পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৯৮০-১৯৮৫ সনে নির্মিত সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রিত বাঁধ রয়েছে চলন বিল এলাকার চারপাশ ঘিরে।

৩.২. বহির্বিভাগীয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত

(১) কৃষি জমির ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে বিএডিসি পাবনা জেলাধীন এলাকায় ১১৯টি গভীর নলকূপ, ৫৯৮৩টি অগভীর নলকূপ এবং ৮৩২টি লো লিফট পাম্প। পাবনা, নাটোর ও সিরাজগঞ্জ জেলায় সর্বোমোট গভীর নলকূপ ৩৪০টি, অগভীর নলকূপ ২৩ হাজার এবং লো লিফট পাম্প রয়েছে প্রায় ৩ হাজারটি। এর মধ্যে কিছু অংশ রয়েছে অচল অবস্থায়।

(২) কৃষি ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে ২২৮ জন পাইকারি ও ৭৫০ জন খুচরা কীটনাশক বিক্রির

কাজ শুরু হয় ১৯৮৫ সনের দিকে তা সমাপ্ত হয়। উক্ত বাঁধ নির্মাণের ফলে চলন বিল এলাকায় প্রাকৃতিক প্রজনন সমৃদ্ধ নদী-উপ নদী থেকে মাছের রেনু ও পোনাবাহী পানি প্রবেশ করতে না পারায় চলন বিলে মাছের উৎপাদন হ্রাস পায়। বাইরের পানি গমন নির্গমন করতে না পারায় বিল এলাকায় মৎস্য সম্পদ বিনষ্টকারী দ্রব্যাদি দিনে পর দিন জমা হতে হতে পরিবেশকে মাছের বসবাস ও প্রজননের অনুপযোগী করে তোলে এবং মাছের উৎপাদন হ্রাস পায়। চলন বিলে অভ্যন্তরীণ এলাকায় মাছের প্রজনন কিছুটা হলেও বিঘ্নিত হয় এর প্রভাবে।

৪.২ জলাশয় সংকোচন ঃ চলন বিল এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণের কারণে বাইরের নদী-উপনদীর চেয়ে ভেতরের পানির উচ্চতা কম থাকে। ফলে বর্ষাকালে প্লাবন ভুমির জলাশয় এলাকা কমে আসে এবং শুষ্ক মৌসুমে পানির স্বল্পতা দেখা দেয় স্থায়ী জলাশয়ে। এমনকি শুষ্ক মৌসুমে সম্প্রতি ৭৫ ভাগ জলাশয় পানিশূন্য হয়ে পড়ে। শুষ্ক মৌসুমের পানির স্বল্পতা ও শূন্যতা এবং বর্ষা মৌসুমের প্লাবন ভূমির হ্রাস প্রাপ্তি চলন বিলের মাছের উৎপাদন হ্রাস করে উল্লেখযোগ্য হারে। দিনের পর দিন কৃষি শস্য নিবিড়করণ প্রক্রিয়ায় চলন বিল এলাকায় মাটির বাধন হালকা হয়ে সংশ্লিষ্ট জলাশয়ে পড়ে জলাশয় ভরাট করে ফেলে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই ভরাট হওয়া জলাশয়কে শ্রেণী পরিবর্তনের মাধ্যমে কৃষি জমিতে পরিণত করা হয়। সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিএডিসির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ৩৫০ গভীর ও ২৩ হাজার অগভীর নলকূপ ভূ-গর্বস্থ পানির স্তর হ্রাস করে। ২০০০ টি লো লিফট পাম্পের মাধ্যমে সরাসরি জলাশয়ের পানি ইরি ধান ক্ষেতে তুলে আনার ফলেও জলাশয়ের সংকোচন ঘটে। উপরোক্ত অবস্থায় চলন বিল এলাকায় জলাশয় সংকোচনে মাছের প্রজনন, বংশবিস্তার ও উৎপাদন ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয় দারুন ভাবে।

৪.৩ কীটনাশকের ব্যবহার ঃ চলন বিল এলাকায় প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার কৃষকের প্রায় ৮২ হাজার হেক্টর জমির মধ্যে প্রায় তিন চতুর্থাংশ জমিতেই ইরি ধানের আবাদ হয় যেখানে চাষীরা অনিয়ন্ত্রিত ভাবে মৎস্য সম্পদের ক্ষতিকারক কীটনাশক ব্যবহার করে থাকে। উক্ত কীটনাশকের এনড্রিন গ্রুপসহ যে সকল কীটনাশক ব্যবহার করে থাকে তাদের বিষাক্ত ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন ও অন্যান্য ক্ষতিকারক অণু জলাশয় সমূহে পতিত হয়ে মৎস্য প্রজনন ও বংশবিস্তারের ক্ষতি সাধন করে। এমনকি এ বিষাক্ত অণু সমূহের ক্রমপুঞ্জিত মজুদ পানির পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার মাধ্যমে তাকে মাছের মৃত্যু ফাঁদে পরিণত করে।

৪.৪ কারেন্ট জাল সহ ক্ষতিকারক সরঞ্জামের ব্যবহার ঃ মৎস্য সংরক্ষণের প্রচলিত আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সীমাবদ্ধতা অনেক। মৎস্য কর্মকর্তাদের ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা না থাকায় মৎস্য আইন প্রয়োগে বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের প্রয়োজন পড়ে। প্রয়োজনে ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের সংস্থান করার সময়কালীন কারেন্টজাল বিপণনকারী ও ব্যবহারকারীরা আনন্দ উল্লাসে মৎস্য সম্পদ ধ্বংস করতে থাকে। আর ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ ব্যতিত আইন প্রয়োগের বিষয়টি ব্যক্তি জীবনের হুমকি স্বরূপ। চলন বিল এলাকায় কারেন্টজাল, কাঁথাজাল, বেড়জাল, বাঁধ নির্মাণ, বানা স্থাপন, ডিমওয়ালা ও ছোট মাছ ধরা ইত্যাদির মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ বিনষ্টের ঘটনা ঘটে আসছে। মারাত্মক ক্ষতিকারক কারেন্টজালের বিপণন ও ব্যবহারে নিয়োজিত দরিদ্র জনগোষ্ঠির পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক ক্ষেত্রেই থাকে কিছু প্রভাবশীল ব্যক্তিবর্গের সংযোগ। ফলে আইন প্রয়োগে বহুবিধ সীমাবদ্ধতায় চলন বিল এলাকায় কারেন্টজাল ও ক্ষতিকর সরঞ্জাম ব্যবহার মৎস্য সম্পদ হ্রাসের অন্যতম কারণ।

৪.৫ অভয়াশ্রমের অভাব ঃ চলন বিল এলাকাটি বর্ষা মৌসুমে আমন ধানের আবাদ না থাকায় মাছের আশ্রয়বিহীন খোলা জলাশয়ে পরিণত হয়। আর এই কারণে বর্ষাকালে আশ্রয়ের অভাবে মৎস্য প্রজাতিসমূহ মৎস্য আহরণকারীদের মরণ ফাঁদ থেকে বাঁচতে পারে না। বর্ষা মৌসুমে প্রজননকালীন সময়ে ছোট বড় ডিমওয়ালা সর্ব প্রকার মৎস্য নিধন চলতে থাকে বিল এলাকায়। চলন বিলে মৎস্য সম্পদ হ্রাস প্রাপ্তি এটাও একটা উল্লেখযোগ্য কারণ।

৪.৬ অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে মাছের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে আসছে দিনের পর দিন। অসচেতন মৎস্যজীবিরা বেশির ভাগই অর্থ সংকটে ভোগে সারা বছর। তাই অসচেতন দরিদ্র মৎস্যজীবিসহ সংশ্লিষ্ট সর্বস্তরের জনগণ জীবন ধারণের চাহিদা মেটাতে প্রতিযোগিতায় নেমে পরে মৎস্য আহরণে। এই অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণের ঘটনাটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে মাছের প্রজনন সংশ্লিষ্ট সময়ে। একই ভাবে শুষ্ক মৌসুমে জলাশয়ে পানি সংকোচনের সুযোগে জলাশয় সেচে মাছ ধরার প্রবণতাও কম নয়। এরূপ ভাবে অসচেতন, লোভী, দরিদ্র মৎস্যজীবি ও অন্যান্য জনগোষ্ঠি কর্তৃক অনিয়ন্ত্রিত ও ক্ষতিকর পদ্ধতির মৎস্য আহরণ চলন বিলে মৎস্য সম্পদ হ্রাস প্রাপ্তির একটি উল্লেখ্যযোগ্য কারণ।

আত্ম-কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনে ময়মনসিংহ মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্পের অবদান

মো: আব্দুল খালেক, মোহাম্মদ আলী রেজা
মো: রফিকুল ইসলাম আকন্দ, মৎস্য অধিদপ্তর

১. পটভূমি

ময়মনসিংহ মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প (এমএইপি) পরিবেশ বান্ধব আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে পুকুরে মাছ চাষের কলা-কৌশল সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে ময়মনসিংহ জেলার ৬টি উপজেলায় তার অগ্রযাত্রা শুরু করে। মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রাণালয়ের মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এবং ডানিডার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল ডানিডার কাছ থেকে আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান এ্যাকুয়াকালচার এক্সপেরিমেন্টাল স্টেশন (এইএস) কর্তৃক অর্জিত ফলাফল মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়া।

১.১ সময়কাল ও ভৌগোলিক এলাকাঃ এমএইপি তার কার্যক্রমসমূহ মোট তিনটি ধাপে পরিচালনা করে আসছে। গত ১৯৮৯ সন থেকে শুরু করে ২০০৩ সন পর্যন্ত কর্মরত ৭টি জেলার মোট ৩৮টি উপজেলা প্রকল্পের আওতায় এসেছে। প্রকল্পনাধীন উপজেলাসমূহের পার্শ্ববর্তী কয়েকটি উপজেলার অংশবিশেষেও এমএইপি কাজ করে আসছে।

১.২ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- অভিষ্ট জনগোষ্ঠী ভূমিহীন ও প্রান্তিক পুরুষ ও মহিলা চাষীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়ন;
- আধা-নিবিড় পদ্ধতি প্রয়োগে বদ্ধ জলাশয়ে মাছের বৃদ্ধিকরণ;
- উপজেলা পর্যায়ে মৎস্য চাষ উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- কর্ম এলাকার বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং এনজিও থেকে মৎস্য চাষী কর্তৃক ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা।

১.৩ অভীষ্ট জনগোষ্ঠী ঃ পুকুরে মাছ চাষের সুযোগ আছে (নিজস্ব বা ইজারাকৃত পুকুরে) এমন দরিদ্র পুরুষ ও মহিলা; তবে ভূমিহীন এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নিয়োগকৃত সম্প্রসারণ কর্মী ও প্রশিক্ষকরাও অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে। মাছ চাষ সহযোগী হিসাবে যেমন মাছ আহরণকারী, পোনা বা বড় মাছ বিক্রেতা, জাল প্রস্তুতকারী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এমন দরিদ্র পুরুষ ও মহিলা।

২. সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণ কৌশল

মৎস্য চাষীর চাহিদার ভিত্তিতে পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করে এমএইপি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছে। মৎস্য চাষ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য অর্জনে প্রশিক্ষণকে প্রধান উপায় হিসাবে বেছে নেয়ার কারণে সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ বিষয় দুটি অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে পরে। স্বভাবত:ই একটি কৌশলের পরিবর্তন আনয়নের সাথে সাথে অপরটিরও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

২.১ একক চাষী সংযোগ কৌশল ঃ মৎস্য চাষ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের লক্ষ্যে চাষী নির্বাচন এবং তাদের সহায়তা প্রদানে এমএইপি ১৯৯৭ সন পর্যন্ত একক চাষী সংযোগ কৌশল অনুসরণ করেছে। তবে, অভীষ্ট চাষীর সাথে কাজ করার সময় ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা হলেও প্রশিক্ষণ পরিচালানার ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে একটি দল গঠন করে নেয়া হতো। চাষীকে বিশেষত প্রদর্শনী ও সংযোগ চাষীকে নিবিড়ভাবে কারিগরী সহায়তা প্রদানে একক কৌশলটি বিশেষ ফলপ্রসূ হিসাবে প্রমাণিত হয়। তবে, সার্বিকভাবে এ কৌশলটি যথেষ্ট ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ বিবেচিত হওয়ায় প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সর্বোপরি প্রকল্পের স্থায়িত্বের বিষয়টি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পরে।

২.২ চাষীর দল গঠন কৌশল ঃ উপরোল্লিখিত সকল সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে উঠার অভিপ্রায়ে ১৯৯৮ সাল থেকে এমএইপি চাষীর দল গঠন কৌশল অনুসরণ করে আসছে। এই কৌশল অনুসরণে বিপুল সংখ্যক চাষীকে প্রকল্পের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। চাষী দল গঠন কৌশলটি প্রশিক্ষণ পরিচালনা, ঋণ ব্যবস্থাপনা ও বৃহত্তর পরিসরেও মোট ১,০৮,৫০০ জন অভীষ্ট মৎস্যচাষীকে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

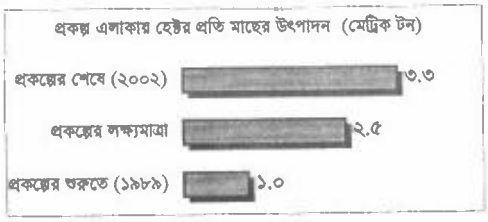

সারাদেশে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে চাষের মাধ্যমে মাছের মোট উৎপাদনের ৩৯%, যেখানে এমএইপির কর্ম এলাকার আয়তন হচ্ছে দেশের মোট আয়তনের ১০% মাত্র।

এমএইপি কর্মসূচি শুরুর পূর্বে (বেজলাইন সার্ভে অনুযায়ী) পুকুরে মাছের উৎপাদন ছিল ১.০ মে.টন/হেক্টর/বছর এবং প্রকল্পত্তোর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয় ২.৫ মে.টন/হেক্টর/বছর। ২০০২ সনে এসে দেখা যায় যে, এ লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে; বর্তমানে চাষীরা গড়ে প্রতি হেক্টরে প্রতি বছর ৩.৩ মে.টন মাছ উৎপাদন করছে। এমএইপি কর্তৃক সরাসরি প্রশিক্ষিত চাষীরাই শুধুমাত্র ২০০২ সনে মোট ২০,০০৯ মে.টন মাছ উৎপাদন করেছে।

উল্লেখ্য যে, দরিদ্র এই ক্ষুদ্র চাষীদের পুকুরের গড় আয়তন ১০ শতাংশ মাত্র। ইম্প্যাক্ট স্টাডি অনুযায়ী এমএইপি'র অভীষ্ট এই ক্ষুদ্র চাষীদের পুকুরে মাছের উৎপাদন হার এলাকার অন্য ধনী চাষীদের চেয়ে বেশি যা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এমএইপি প্রযুক্তি দরিদ্রদের জন্য উপযুক্ত/লাগসই অর্থাৎ দারিদ্র বিমোচনে যথেষ্ট কার্যকর।

৬. মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং আত্ম-কর্ম সংস্থান

লাভজনক উপায়ে মাছ চাষ কর্মকাণ্ড পরিচালনাই শুধু নয় বরং মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের সার্বিক লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এমএইপি কাজ করে আসছে। অতএব, প্রকল্পটি কেবলমাত্র মাছ চাষ বা মাছ চাষ সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রকল্প বাস্ত বায়নকারী এনজিওর মাধমে অন্যান্য আর্থ-সামাজিক বিষয়াদিকে অন্তর্ভূক্ত করেছে। এ উপলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং চাহিদানুযায়ী ঋণ সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

৬.১ আত্ম-কর্মে নিয়োজিত মৎস্য চাষী ও সহযোগী উপকারভোগীঃ

ধাপসমূহ	পুকুরে মাছ চাষী	ধান ক্ষেতে মাছ চাষী	মাছ চাষ সহযোগী	মোট চাষী
ধাপ-১	৩,৮৫০	-	-	৩,৮৫০
ধাপ -২	৪৩,৫০০	৮৫০	৯,৫০০	৫৩,৮৫০
কনসলিডেশন ধাপ	৩৪,৯১১	৩,৮০০	১২,০৯১	৫০,৮০০
সর্বমোট	৭৭,৭৫০	৪,৬৫০	২১,৫৯১	১,০৮,৫০০

প্রকল্পের শুরু থেকে এমএইপি এ পর্যন্ত (জুন ২০০৩) মোট ১,০৮,৫০০ জন চাষীকে সরাসরি প্রশিক্ষণ দিয়েছে। পাশাপাশি চাষী থেকে চাষী সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ায় মাছ চাষে যুক্ত হয়েছে আরও অনেক চাষী। প্রকল্পের ইম্প্যাক্ট স্টাডি (২০০২) অনুযায়ী দেখা যায় যে, এমএইপি'র কর্ম এলাকার মোট জনসংখ্যার ১০% হচ্ছে মাছ চাষী (পুকুরে)। মূল্যায়নে দেখা যায় যে, তারা সকলেই মাছ চাষ ও সংশ্লিষ্ট কাজে জড়িত হয়ে আত্ম-কর্ম সংস্থানের উপায় খুঁজে পেয়েছে এবং প্রতি বছরই মোট জাতীয় উৎপাদনে যথেষ্ট অবদান রেখে আসছে। কর্ম এলাকার ৩৪% পরিবার (খানা) তাদের পুকুরে মাছ চাষ করছে। মাছ চাষে সরাসরি জড়িত চাষী ছাড়াও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তি আজ এ ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ যেমন, হ্যাচারী, নার্সারী, উপকরণ সরবরাহ ইত্যাদিতে জড়িত।

৬.২. আত্ম-কর্ম সংস্থানে সম্প্রসারণ কর্মীঃ প্রকল্পে স্থানীয়ভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত সম্প্রসারণ প্রশিক্ষক/কর্মী হচ্ছে এমএইপি'র অভীষ্ট জনগোষ্ঠী। প্রকল্প শেষে যাতে করে এই কর্মীরা আত্ম-কর্ম সংস্থান খুঁজে পায় এমএইপি সেই লক্ষ্যেই তাদেরকে প্রশিক্ষিত করেছে ও মাছ চাষ বা সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত হতে অথবা অন্য কোন সংস্থায় চাকুরির জন্য সকল প্রকার সহযোগিতা করে আসছে। এমএইপি'র সম্প্রসারণ প্রশিক্ষকরা আজ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মাছ চাষ বিষয়ে পরামর্শ/সেবা প্রদান করছে।

৭. দারিদ্র বিমোচন

এমএইপি'র সকল কর্মকাণ্ডই তার লক্ষ্য অর্থাৎ দারিদ্র বিমোচনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। আর তাই প্রকল্পের যে কোন কর্মসূচির মূল্যায়নে সর্বাগ্রে যে বিষয়টি বিবেচিত হয় তা হল কাজটি অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা কতটুকু উন্নীত করতে পেরেছে। ইম্প্যাক্ট স্টাডিতে (২০০২) দেখা যায় যে, এমএইপি'র কর্মকাণ্ডের প্রভাবে এলাকার ১৭.৮ লক্ষ (কর্ম এলাকার মোট জনসংখ্যার ১০%) মানুষ দারিদ্র বন্ধনীর মধ্য থেকে বেড়িয়ে আসার প্রয়াস পেয়েছে। গৃহিত সমন্বিত পুকুর চাষের কৌশল তথা প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা দারিদ্র বিমোচনে এই সফলতায়

গ্রামীণ দরিদ্র মৎস্য চাষী ও মৎস্যজীবিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিও-দের ভূমিকা

এম এম হুসেইন (গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশন), ডঃ আনোয়ারা বেগম শেলী (কারিতাস)
মোঃ আবদুর রহমান (প্রশিকা), মোঃ মোকাররম হোসেন (ব্র্যাক)

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে গ্রামীণ জনগণ। আর তাই গ্রামীণ সমাজের উন্নয়নই দেশের মূল উন্নয়নের ভিত্তি। গ্রামীণ সমাজের বেশির ভাগ মানুষ অন্ন, বস্ত্র, খাদ্য, বাসস্থান ও পুষ্টির নিরীখে দারিদ্রসীমার নিচে বাস করছে। মানব সম্পদ আছে-ভূমি নেই, উৎপাদন উপযোগী সম্পদ আছে-অর্থ, সম্পদ ব্যবহারের প্রয়োজনীয় জ্ঞান/দক্ষতা নেই, নেই কর্ম সংস্থান। এ সকল কারণে এনজিওরা সাধারণত প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলকেই কর্ম এলাকা হিসাবে বেছে নেয়। আমাদের দেশের অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে আছে মৎস্য সম্পদ। অথচ মৎস্য উৎপাদন, আহরণের উপর যাদের জীবন-জীবিকা নির্ভরশীল সমাজের পিছিয়ে পড়া সেই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নকল্পে এনজিওরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি মৎস্য সম্পদের স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন, সম্পদে গরিবদের অংশ গ্রহণ, প্রাপ্ত আয়ের সুষম বন্টন বিষয়েও এনজিও কার্যক্রম সম্প্রসারিত। অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে দুর্বল গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী তথা সমাজের এসব সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জীবন-জীবিকা ও সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বেসরকারি সংস্থা সমূহ সরকার ও দাতা সংস্থার সাহয়তায় তাদের পাশে ও সঙ্গে থেকে তাদের সুসংগঠিত করার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে।

২. মাৎস্য সম্পদ উন্নয়নে এনজিওদের ক্ষেত্র সমূহ

দারিদ্র বিমোচন ও আয় বৃদ্ধি মূলক কর্মকান্ডে মৎস্য সেক্টর অধিক কার্যকরী ও লাভজনক। আবহমান কাল থেকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মৎস্য খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুতপূর্ণ। দেশের মাৎস্য সম্পদের বহুমুখী উন্নয়নে বিশেষ করে মৎস্যজীবী, মৎস্য চাষী এবং এর সাথে সম্পর্কযুক্ত পেশার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়ন ও তাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনেক এনজিও অংশিদারিত্বমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হচ্ছে। দেশে বর্তমানে তিন শতাধিক এনজিও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত। মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনে এনজিও সমূহ যে সমস্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে তাহল-

২.১. পুকুরে মৎস্য চাষঃ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিজস্ব পুকুর বা জলাশয় নাই বললেই চলে। সাধারণতঃ ব্যক্তি মালিকানাধীন অচাষকৃত পুকুর দল বা গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে লীজ গ্রহণ করে পুকুরে মাছ চাষ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এছাড়া বিভিন্ন হাজা মজা পুকুর বা ব্যক্তি মালিকদের নিকট থেকে দীর্ঘ মেয়াদী (৭-১০ বৎসর) লীজ গ্রহণের মাধ্যমে MCC, WFP, IFADEP এর সহায়তায় পুনঃ খনন করে সেই সমস্ত পুকুরে মৎস্য চাষ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে।

২.২. ঘেরে চিংড়ি চাষঃ স্বাদু পানিতে গলদা চিংড়ি চাষ উপযোগিতা বিবেচনা করে দেশের আভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় জলাশয়ে গলদা চিংড়ি চাষের প্রসারের জন্যও এনজিওরা কাজ করছে। উপকূলীয় অঞ্চলে লোনাপানির চিংড়ি বিশেষ করে বাগদা চাষে দরিদ্র জমির মালিকদের সংগঠিত করে নিজেদের জমিতে অধিকার প্রতিষ্ঠা ও পরিবেশ বান্ধব উপায়ে চিংড়ি চাষে সহায়তা দিচ্ছে।

২.৩. মিনি মৎস্য হ্যাচারী ও নার্সারীঃ পোনার সহজ প্রাপ্যতা এবং গুণগত মানের পোনার নিশ্চয়তার জন্য এনজিওদের কারিগরী ও আর্থিক সহায়তায় সংগঠিত সদস্যরা মিনি মৎস্য হ্যাচারী ও নার্সারী প্রকল্প বাস্তবায়ন করে পোনার চাহিদা পূরণ সহ তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হচ্ছে।

২.৪. ধানক্ষেতে মাছ চাষঃ এনজিও, মৎস্য অধিদপ্তর, ইকলার্ম (ডঋঈ) যৌথ ভাবে মৎস্য প্রযুক্তি হস্তান্তর ও ফলাফল মূল্যায়ন প্রকল্পের আওতায় ধানক্ষেতে মাছ চাষ করে যে সফলতা অর্জন করেছিল তার ভিত্তিতে পরবর্তীতে এনজিওরা তাদের সংগঠিত সদস্যদের দ্বারা ধানক্ষেতে মাছ চাষ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে।

২.৫. পেনে মাছ চাষঃ সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও লাগসই প্রযুক্তি উন্নয়নে এনজিওরা তাদের সংগঠিত সদস্যদের দ্বারা

জটিলতা বিহীন। এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণে কোন দীর্ঘ সূত্রিতা বা কোন ধরনের জামানতের প্রয়োজন হয় না, শুধুমাত্র সঠিক প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরির মাধ্যমে দরিদ্র জনগন ঋণ সুবিধা পেয়ে থাকে। ফলে গ্রামীণ দরিদ্র জনগন সংগঠন তৈরির মাধ্যমে মৎস্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এনজিও প্রদত্ত ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা বড় ধরনের ভূমিকা পালন করছে। এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তার ফলে মৎস্য পেশাজীবিরা দারিদ্রের দুষ্ট চক্রের বলয় থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ভাবে তাদের পেশাগত কাজ বাস্তবায়ন করতে পারছে। দারিদ্রতা বিমোচনে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে।

৩.৪. উপকরণ সহায়তা ঃ বিভিন্ন ধরণের প্যাকেজ উপকরণ সরবরাহ করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে দরিদ্র চাষীদের মাছ চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন - পোনা, চুন, সার, খাদ্য ইত্যাদি ঋণ হিসাবে প্রদান করা হয়। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে চাষীদের ঋণ প্রদান করা হয় অতঃপর চাষী সম্প্রসারণ কর্মীর সহায়তায় নিজের পছন্দমত ও ভাল মানের উপকরণ ক্রয় করে থাকে।

বিভিন্ন এনজিও দেশের বিভিন্ন স্থানে ভালমানের রেনু পোনা সরবরাহের জন্য নিজেদের তত্ত্বাবধানে অথবা ব্যক্তিগত পর্যায়ে কারিগরী ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে মৎস্য ও গলদা চিংড়ি হ্যাচারী পরিচালনা করে। এছাড়াও ব্রুড মাছ উন্নয়নেও এনজিওদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। উদাহরণ স্বরূপ মৎস্য ও গলদা চিংড়ি হ্যাচারী স্থাপনে ব্র্যাক, প্রশিকা, কারিতাস ও গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশনের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপরন্তু মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহায়তায় ব্র্যাক শ্রীমংগলে রুই ও কাতলা ব্রুড উন্নয়নের দীর্ঘ মেয়াদী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

৩.৫. বিপণন সহায়তা ঃ চাষীগণ উৎপাদিত পণ্য বিপণনে এন জি ও-দের বিভিন্ন ধরনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা পেয়ে থাকে । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গ্রামভিত্তিক চাষীদের স্থানীয় নেটওয়ার্ক, সাধারণত পোনা উৎপাদনকারীদের ঘিরে এ ধরণের নেটওয়ার্ক গড়ে উঠে। পোনা উৎপাদনকারীদের পোনা উৎপাদন ও মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সর্বোপরি পোনা বিক্রয়ের তাগিদে স্থানীয় মৎস্য চাষীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এ যোগাযোগ আরও জোরালো হয় এনজিও সম্প্রসারণ কর্মীদের ভূমিকার কারণে। ফলশ্রুতিতে নার্সারী পোনা বিপননে স্থানীয় ক্রেতার সৃষ্টি হয়। উৎপাদিত মৎস্য পণ্য কর্মী বাজারজাতকরণের সময়ও সহায়তা প্রদান করে। পুকুরপাড়ে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ করে নারী মৎস্য চাষীদের পাইকাররা যাতে ঠকাতে না পারে সে ব্যাপারে এনজিও সম্প্রসারণ কর্মীরা সক্রিয় থাকে। বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দর নির্ধারণের জন্য সম্প্রসারণ কর্মী নিয়মিত বিভিন্ন খুচরা ও পাইকারী বাজার মনিটরিং করে মৎস্যজীবিদের সহায়তা করে।

৪. সম্পদে অধিকার নিশ্চিতকরণ ও সম্পদ উন্নয়ন

৪.১. পুকুরে অধিকার নিশ্চিতকরণ ঃ গরিব মৎস্য চাষীদের মৎস্য সম্পদের ক্ষেত্রসমূহে অধিকার নিশ্চিত করা, অধিক মৎস্য উৎপাদন এবং পুকুরের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, মৎস্য চাষীদের মালিকানা বা ভোগ করার অধিকার ও স্থায়ীত্বশীলতা প্রদানে বাংলাদেশের স্বনামধন্য এনজিও সমূহ নিম্ন লিখিত কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়ন করে আসছে-

- ব্যক্তি মালিকানা/বহু মালিকানার অব্যবহৃত হাজামজা পুকুর মালিকদের নিকট থেকে দীর্ঘ মেয়াদি (৭-১০ বৎসর) লীজ গ্রহণের মাধ্যমে MCC, WFP, IFADEP সহ বিভিন্ন সংস্থার নিজস্ব আর্থিক সহায়তায় পুকুর পুনঃখনন করে দল সংগঠিত মৎস্য চাষীদের মৎস্য চাষের সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে ।
- সরকারি বিভিন্ন হাজামজা খাস পুকুরও উল্লেখিত প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন সাধন করে মৎস্য চাষীদের মৎস্য চাষের সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে। মধ্য আশির দশকে গ্রামীণ ব্যাংক তথা গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশনকে প্রায় সহস্রাধিক পুকুর ১০-২৫ বছর মেয়াদী ইজারা দিয়ে বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য/ভূমি মন্ত্রণালয় দারিদ্র বিমোচনে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে।
- ব্যক্তি মালিকানা অথবা বহু মালিকানার অচাষকৃত পুকুরগুলি তিনের অধিক বৎসরী মেয়াদে লীজ নিয়ে মৎস্য চাষের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হচ্ছে ।
- স্বল্প পুঁজির অভাবে যে সকল চাষী দীর্ঘ মেয়াদে পুকুর লীজ নিতে পারে না তাদেরকে ঋণ সহায়তা দিয়ে পুকুর লীজ নেয়ার ব্যবস্থা করে দেয়া হচ্ছে ।
- দেশের উত্তরাঞ্চলের বড় আয়তনের খাস পুকুর এনজিওরা সরকারের নিকট থেকে দীর্ঘ মেয়াদে লীজ নিয়ে সংগঠিত দলীয় মৎস্য চাষীদের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মৎস্য চাষের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হচ্ছে। ফলে মাছের সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি সহ গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে ।

৪.২. জলমহালে অধিকার প্রতিষ্ঠা, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ঃ মৎস্যজীবীদের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে জলাভূমি সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে মাৎস্য সম্পদ তথা জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দারিদ্রতা বিমোচনের লক্ষ্যে এনজিওরা কাজ করছে। সম্পদের অধিকার অর্জন, সম্পদ

থাকে। প্রশিক্ষণের পরে প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্প্রসারন কর্মীগণ সরেজমিনে গুনগত মান সম্পন্ন উপকরণ বিশেষ করে পোনা সংগ্রহে চাষীদের সহায়তা দিয়ে থাকে। গ্রাম উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশের এনজিও সমূহ উচ্চশিক্ষিত, শিক্ষিত ও লাগসই প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একটি বেসরকারী ক্যাডার সার্ভিস সফলতার সাথে সৃষ্টি করতে পেরেছে যারা গ্রামের সন্তান, মাটি ও মানুষের সন্তান, যারা গ্রামেই থাকে, গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সুখ-দুঃখের অংশীদার, সাহসী, নির্ভিক ও দেশ প্রেমিক এক কর্মী বাহিনী।

৭. এনজিও অভিজ্ঞতায় মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে সমস্যাসমূহ

- দীর্ঘ মেয়াদে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনুকূলে খাস জলাশয়ের অপ্রাপ্যতা;
- মৎস্য চাষ উপযোগী ক্ষুদ্র ঋণের অভাব;
- আধুনিক প্রযুক্তি সংক্রান্ত তথ্য সঞ্চালনের অভাব;
- বিপণন সমস্যার কারণে উপযুক্ত দর না পাওয়া;
- সঠিক সময়ে গুণগত মান সম্পন্ন পোনার অভাব;
- পূনঃখনন/সংস্কার প্রকল্পে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ছোট-মাঝারী পুকুরসমূহ অনুদান সহায়তা থেকে বঞ্চিত করা;
- সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব;
- জি ও-এন জি ও এবং এনজিও- এনজিও মধ্যে সমন্বয় এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের অভাব।

৮. উপসংহার

আশার কথা, সরকার গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনে জোর ভূমিকা পালন করছে। যার কাজ তাকে দিয়ে করানোর মানসিকতা ও পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এ কাজ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে এনজিও সমূহকে দায়িত্ব দিচ্ছে। সরকারি সংস্থাসমূহকে পরিকল্পনা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের দায়িত্বে রেখে মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়নের কাজ গ্রামীণ জনগণের মাধ্যমে করার মতো শুভ উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে। এতে গ্রামীন দরিদ্র মৎস্য চাষী ও মৎস্য জীবিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রয়েছে।

অভ্যন্তরে ক্ষীণ স্রোতধারা বা স্রোতধারাবিহীন নদীতে অভয়াশ্রম সংরক্ষণ সমীচিন হবে। এসমস্ত অভয়াশ্রম সংরক্ষণে মৎস্যজীবীদেরকে মৎস্যজীবী সংগঠন ও মৎস্যবিভাগের তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব পালনে অগ্রণী ভূমিকা নেয়া উচিত।

৪। সরকারের সহায়ক ভূমিকা

(১) সরকারকে উন্মুক্ত জলমহালের ইজারা বিলুপ্তির ঘোষণাকে কার্যকর করার জন্য, উন্মুক্ত জলাশয়ের উৎপাদনে ইতিবাচক সাফল্য আনতে হলে এবং জলমহালে মৎস্যজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করার প্রয়োজনে ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে। এই উপলক্ষে ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ সনের গেজেট নটিফিকেশনে কিঞ্চিৎ সংশোধন প্রয়োজন।

(২) উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যজীবীদেরকে মৎস্যজীবী সংগঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করে টোকেন সেলামীতে নির্দিষ্ট জাল/আহরণ পদ্ধতির উল্লেখপূর্বক বার্ষিক, ত্রি-বার্ষিক পদ্ধতিতে মৎস্য উৎপাদনের সংগে তালিকা আকারে নিবন্ধনের মাধ্যমে অধিকারপত্র প্রদান করা যেতে পারে।

(৩) মৎস্য বিভাগ ও মৎস্যজীবী সংগঠনের তত্ত্বাবধানে সরকারী ব্যয়ে উন্মুক্ত জলাশয়ে জৈবিক পরিচর্যার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অভয়াশ্রম স্থাপন করা উচিত যাতে সম্পদের সহনশীলতা নিশ্চিত থাকে।

(৪) প্রবাহমান নদী ও খালের ভরাট অংশ খননপূর্বক মুক্ত জলাশয়কে বাধাহীনভাবে প্রবাহমান রাখতে হবে। নদীর সংগে সংযুক্ত হাওর-বাওর বিল-বাদালের ভরাট খালকে খনন করে মাছের চলাচলকে প্রতিবন্ধকতাবিহীন করা প্রয়োজন।

(৫) নদীতে কারেন্ট জাল, বেড় জাল, মশারি জাল এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ ও ক্ষতিকারক জালের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ করতে হবে এবং মৎস্য আইন প্রতিপালনে মৎস্যজীবী সংগঠনসমূহে সরকারী ব্যয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

(৬) উন্মুক্ত জলাশয়ে নগর ও শিল্প বর্জ্যসহ মাছের ক্ষতিকর অন্যান্য বৈর্জ্যের নিষ্কাশন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা আবশ্যক।

৫। উপসংহার

উপরোল্লিখিত পরামর্শমূলক বিষয়গুলো বাস্তবায়নে মৎস্যজীবী ও সরকার স্ব স্ব ভূমিকা পালনে ব্রতী হলে আশা করা যায়, উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্ত বায়ন, উৎপাদনে নিশ্চিত অগ্রগতি ও মৎস্যজীবীদের অধিকারসহ দারিদ্র বিমোচনে ইতিবাচক সাফল্য সাধিত হবে।

9. **FISH INTAKE & DEMAND**

i)	Per Capita Annual Fish Intake	:	13.5 kg.
ii)	Annual Total Fish Demand	:	2.4 million mt.
iii)	Per Capita Annual Fish Needed	:	18.0 kg.
iv)	Contribution to Animal Protein Supply	:	63 %

10. **PRIVATE FISH HATCHERY & NURSERY**

i)	Fish Hatchery	:	783 nos.
ii)	Fish Nursery	:	4,862 nos.
iii)	Spawn Production in Hatchery	:	276,481 kg.
iv)	Natural Fish Fry Collection	:	1,975 kg.
v)	Fingerling Production in Nursery	:	4,229 million

11. **PRIVATE SHRIMP HATCHERY**

i)	Bagda Hatchery	:	44 nos.
ii)	Bagda Fry Production (Pls)	:	3,050 million
iii)	Galda Hatchery	:	28
iv)	Galda Fry Production	:	-
v)	Natural Shrimp Fry Collection	:	450 million

12. **PUBLIC SECTOR INFRASTRUCTURE (No.)**

i)	Fish/Shrimp Training Centre	:	7
ii)	Fish Hatchery/FSMF	:	113
iii)	Shrimp Hatchery	:	1
iv)	Prawn Hatchery	:	5
v)	Shrimp Demonstration Farm	:	2
vi)	Shrimp Landing & Service Centre	:	21
vii)	Fish Landing Centre	:	9
viii)	Fisheries Research Station/Sub-station	:	7

13. **MARINE FISHING UNIT (No.)**

i)	Industrial Fishing Trawlers	:	80
ii)	Artisanal Mechanised Boats	:	21,433
iii)	Artisanal Non-Mechanised Boats	:	22,527
iv)	Total Artisanal Boats	:	43,960
v)	Total Gears	:	218,581

14. **FISH SPECIES (No.)**

i)	Freshwater Fish Species	:	260
ii)	Exotic Fish Species	:	12
iii)	Freshwater Prawn Species	:	24
iv)	Marine Fish Species	:	475
v)	Marine Shrimp Species	:	36

15. **MANPOWER OF FISHERIES ORGANISATIONS**

i)	Department of Fisheries	:	Total : 4,411 (Class I : 867)
ii)	Bangladesh Fisheries Research Institute	:	Total : 376 (Class I : 171)
iii)	Bangladesh Fisheries Development Corporation	:	Total : 688 (Class I : 78)

Compiled by Fisheries Resources Survey System, Department of Fisheries

MARINE FISHING ZONES OF BANGLADESH

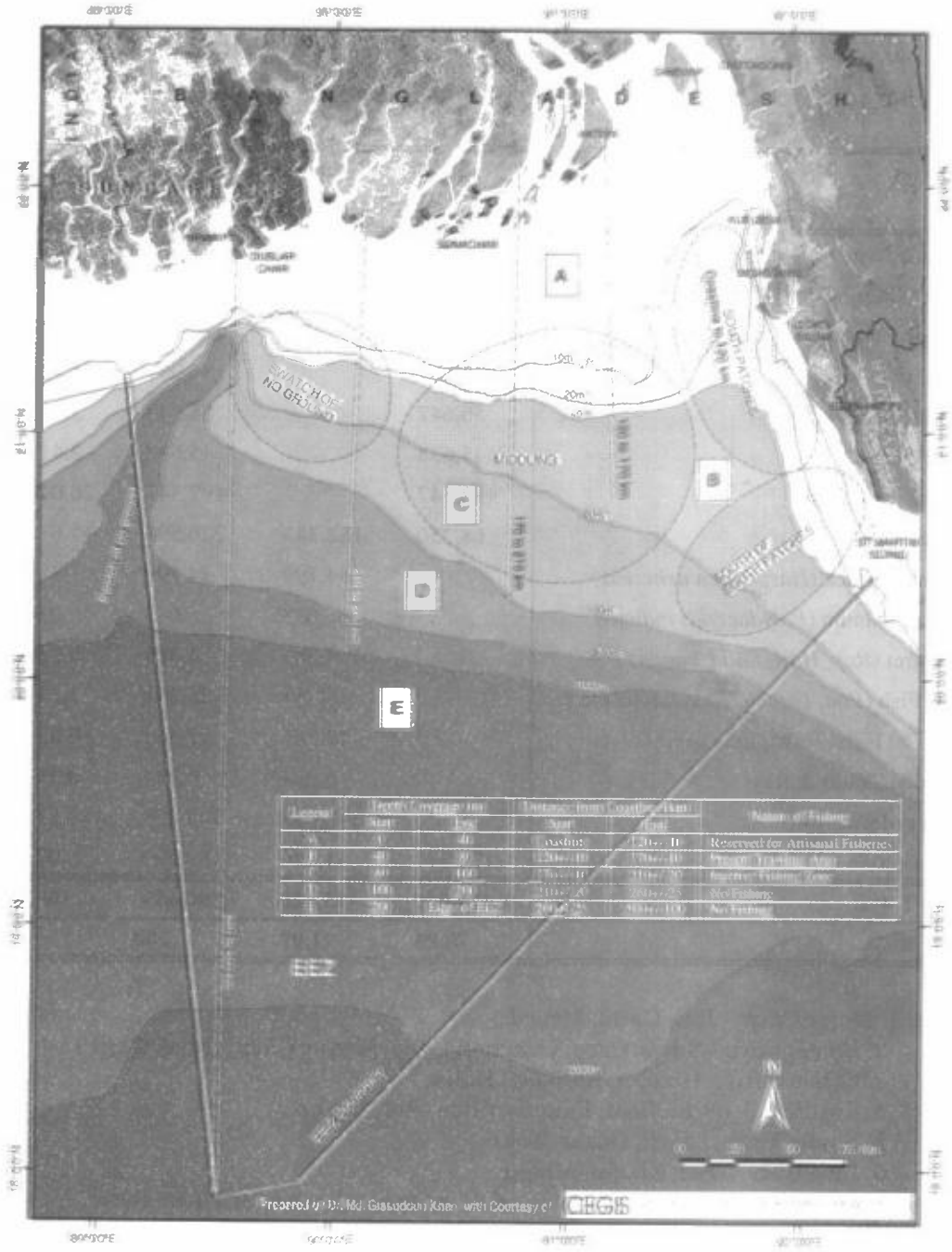

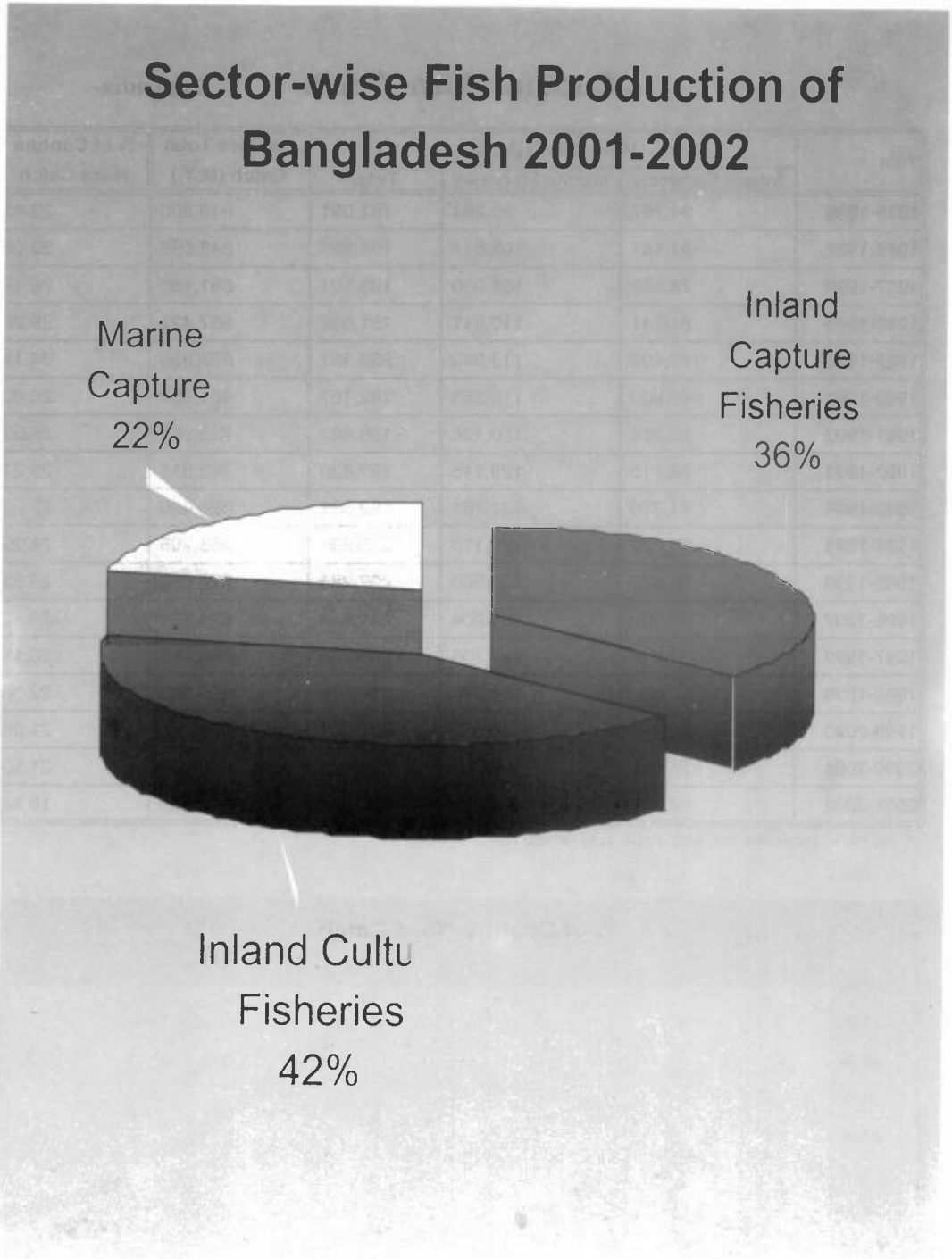

Sector-wise Fish Production of Bangladesh 2001-2002
Marine Capture 22%
Inland Capture Fisheries 36%
Inland Cultu Fisheries 42%

Appendix-

Area-wise Total Production of Shrimp Farms
2001-2002

District	Area of Shrimp Farms in Hectare	Catch in Metric Ton		
		Shrimp	Fish	Total
Chittagong Division				
Chittagong	807.06	297.00	157.38	454.38
Cox's Bazar	28,908.75	13,673.84	6,128.66	19802.5
Noakhali	65.18	20.53	8.47	29
Feni	4.86	0.85	0.49	1.34
Laxmipur	5.30	0.90	0.55	1.45
Chandpur	0.36	0.03	0.03	0.06
Sub-Total	**29,791.51**	**13,993.15**	**6,295.58**	**20288.73**
Khulna Division				
Khulna	29,551.46	13,889.19	7,003.70	20892.89
Bagerhat	47,710.38	23,759.77	11,450.49	35210.26
Satkhira	29,544.16	12,940.34	6,647.44	19587.78
Jessore	895.15	208.57	174.55	383.12
Jhenidah	6.40	1.52	0.86	2.38
Magura	4.25	0.96	0.57	1.53
Narail	249.79	63.70	49.46	113.16
Sub-Total	**107,961.59**	**50,864.05**	**25,327.07**	**76,191.12**
Barisal Division				
Barisal	64.39	9.14	7.40	16.54
Pirojpur	2,293.52	580.26	275.22	855.48
Bhola	84.00	10.67	9.16	19.83
Jhalakathi	51.43	-	-	-
Patuakhali	245.92	21.40	24.84	46.24
Barguna	618.00	70.45	63.04	133.49
Sub-Total	**3,357.26**	**691.92**	**379.66**	**1071.58**
Dhaka Division				
Dhaka	4.00	-	-	-
Faridpur	0.59	0.07	0.06	0.13
Gopalganj	141.70	16.72	14.31	31.03
Madaripur	39.46	7.50	3.91	11.41
Sariatpur	1.42	0.16	0.11	0.27
Rajbari	1.70	-	-	-
Jamalpur	1.06	-	-	-
Kishoregonj	52.25	5.85	4.85	10.70
Sub-Total	**242.18**	**30.30**	**23.24**	**53.54**
TOTAL	**141,352.54**	**65,579.42**	**32,025.55**	**97604.97**

Source : 1. Shrimp Farm Survey 1994 & Catch Assessment Survey, DoF.
2. Chingri Cell. DoF.

Export of Fish & Fish Products from **Bangladesh**
(Quantity)

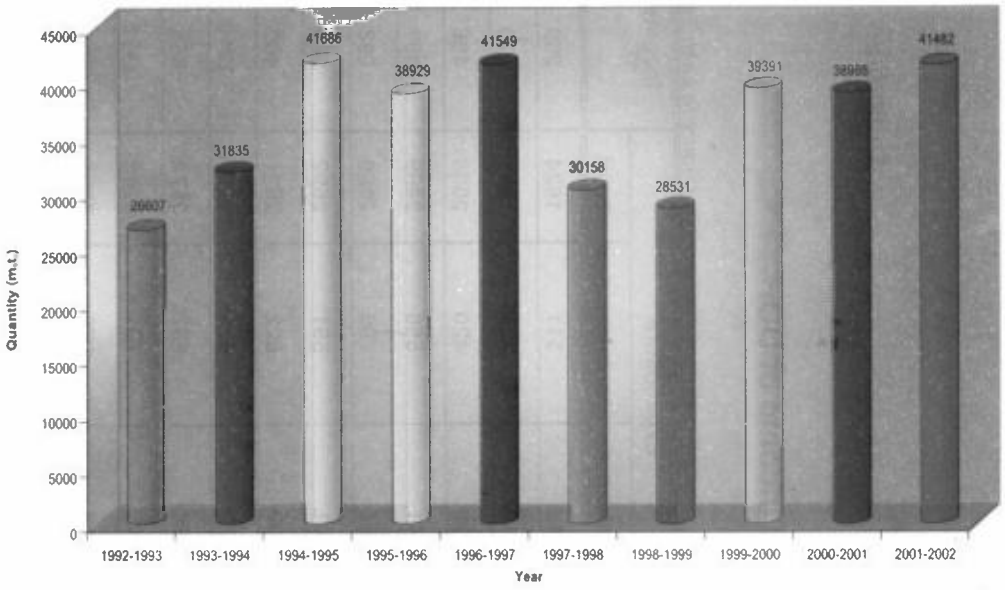

Year-wise Fish Production

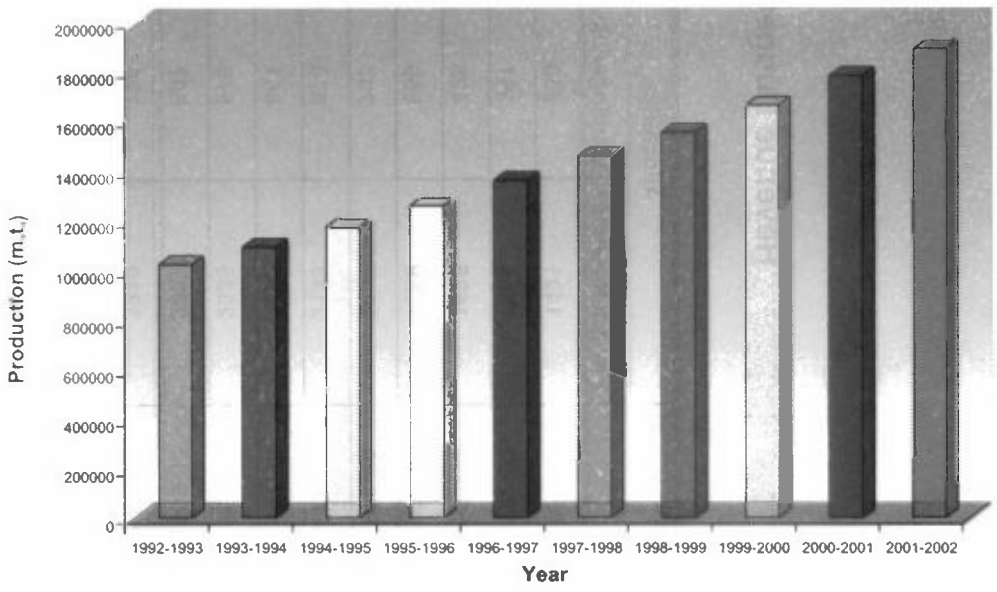

মৎস্য সেক্টরে ২০০৩-২০০৪ আর্থিক সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত প্রকল্পসমূহ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন ২০০৩ সাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		২০০৩-২০০৪ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ			প্রকল্প সাহায্যের উৎস
			মোট (বৈঃ মুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)	মোট	টাকা	মোট	টাকা (রাজস্ব)	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
সংস্থা ঃ মৎস্য অধিদপ্তর (বিনিয়োগ)										
১.	চলতি প্রকল্পঃ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প	০১/০৭/৯৪-৩০/০৬/০৪	৩১৮০.৫৫ (৯৮১.৪২)	৩০৮৬.৯৪ (২১০৫.৫২)	১৯৬৪.২০	৩২.০৬	৫০৮.০০	৮.০০ (৮.০০)	৫০০.০০ (-)	ডানিডা
২.	বৃহত্তর নোয়াখালী জেলায় মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প	০১/০৭/৯৪-৩০/০৬/০৫	৩৫৮১.৩৫ (৬৫৫.১৬)	৩৪১১.৩৫ (২৭৫৬.১৯)	১৮৬৪.২৩	১১৩.৪০	৫৪৮.০০	৮.০০ (৮.০০)	৫৩৮.০০ (-)	ডানিডা
৩.	বালদা চিংড়ি হ্যাচারী উন্নয়ন ও চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান প্রকল্প	০১-০৭-৯৮-৩০-০৬-০৪	৫০০.০০	-	৩৭৮.৩৫	৩৩৭.৩৫	৯৫.০০	৯৫.০০ (৫৭.০০)	-	-
৪.	বাগদা চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প	০১-০৭/৯৭-৩০/০৬/০৪	৮৫২.৮১	-	৪৩১.৭২	৪৩১.৭২	২১৩.০০	২১৩.০০ (১১৮.০০)	-	-
৫.	চর্তুথ মৎস্য প্রকল্প	০১/০৪/৯৯-৩০/০৬/০৪	৩০০৩৫.০০ (৬৫০০.০০)	২৩৯৫৯.০০ (১৭৪৫৯.০০)	১০২৬১.০০	২০৯০.০০	৪৫০৫.০০	৮০৫.০০ (৭৫৬.০০)	৩৭০০.০০ (৩৭০০.০০)	আইডিএ/ডিএফআই ইডি/ডিই এফ
	(১) মৎস্য অধিদপ্তর অংগ		২৫১৩৭.০০ (৬৫০০.০০)	১৯৫৯৩.০০ (১৩০৯৩.০০)	১০০০৩.০০	২০২৫.০০	৩২৮৯.০০	৭৮৯.০০ (৭৪০.০০)	২৫০০.০০ (২৫০০.০০)	ঐ
	(২) পানি উন্নয়ন বোর্ড অংগ		৪৮৯৮.০০ -	৪৩৬৬.০০ (৪৩৬৬.০০)	২৫৮.০০	৬৫.০০	১২১৬.০০	১৬.০০ (১৬.০০)	১২০০.০০ (১২০০.০০)	ঐ
৬.	মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্প (ইফাদ)	০১/০৭/৯৮-৩০/০৬/০৫	১০৯৩৪.০০ (২৭১০.০০)	৯৭৪৮.১২ (৮৭৯৬.১২)	৪৩৮৩.০০	৪৫৭.০০	২৫৬৬.০০	১২৬.০০ (১২৬.০০)	২৪৪০.০০ (২৪০০.০০)	ইফাদ/বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী
	(১) মৎস্য অধিদপ্তর অংগ		৪৩৩৬.২২ (১৯৫৩.০০)	৩৭৭২.৭২ (৩৫৭৭.৪২)	১৬৯০.৯৯	১৯৯.৮৬	১২৮৭.০০	৪৭.০০ (৪৭.০০)	১২৪০.০০ (১২০০.০০)	ঐ
	(২) এলজিইডি অংগ		৬৫৯৭.৭৮ (৭৫৬.৭০)	৫৯৭৫.৪০ (৫২১৮.৭০)	১২৯৭.৫৯	১০০.০০	১২৭৯.০০	৭৯.০০ (৭৯.০০)	১২০০.০০ (১২০০.০০)	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
উপ-মোটঃ মৎস্য অধিদপ্ত			৪৩৬৬.০০ (১২৪১.০০)	৪০৬৭.০০ (২৮২৬.০০)	৩৭৮.০০	১২২.৫৮	৫০৭.০০	২০.০০ (২০.০০)	৪৮৭.০০ (-)	
সংস্থা ঃ মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়										
২০	চলতি প্রকল্প ঃ পলিসি প্লানিং সাপোর্ট ইউনিট	০১/০১/০১- ৩১/০২/০৫	১০০৮.৩২ (৯২০.৩২)	৯২০.৩০ -	৫৩০.০০	-	২০৪.০০	৪.০০ -	২০০.০০ -	জনিড
উপ-মোট ঃ মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়			১০০৮.৩২ (৯২০.৩২)	৯২০.৩০ (০)	৫৩০.০০	-	২০৪.০০	৪.০০ (-)	২০০.০০ -	
সংস্থা ঃ মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট (এফ.আর.আই)										
২১.	চলতি প্রকল্প ঃ রিসার্স ফর সাসটেননেবল এ্যাকুয়াকালচার ডেভেলাপমেন্ট	০১/০১/০২- ৩১/০৭/০৫	১৬২.৫০ -	১৪২.৫০ (১৪২.৫০)	১৭.৪০	-	৫০.০০	২.০০ (২.০০)	৪৮.০০ (-)	ইকলার্ম
উপমোট ঃ এফ.আর.আই			১৬২.৫০ (-)	১৪২.৫০ (১৪২.৫০)	১৭.৪০	-	৫০.০০	২.০০ (২.০০)	৪৮.০০ (-)	

২০০৩-২০০৪ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকা
(এই সমস্ত প্রকল্পের অনুকূলে খাতওয়ারী বরাদ্দে থোক হিসাবে অর্থ সংরক্ষিত আছে)

বিনিয়োগ প্রকল্প (লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	আনুমানিক প্রকল্প ব্যয়		
			মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
সাব-সেক্টর ঃ মৎস্য সংস্থা ঃ মেরিন ফিসারিজ একাডেমী					
১.	মেরিন ফিসারিজ একাডেমী জোরদারকরণ প্রকল্প	জুলাই ০৩-জুন ০৫	৪৩৬.০০	৪৩৬.০০	০
সংস্থা ঃ মৎস্য অধিদপ্তর					
২.	অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আবাস্থল পুনরুদ্ধার প্রকল্প	জুলাই ০৩-জুন ০৬	৩০০০.০০	৩০০০.০০	০
৩.	ক্ষুদ্রাকার জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই ০৩-জুন ০৬	২০০০.০০	২০০০.০০	০
৪.	সামুদ্রিক ক্ষুদ্র মৎস্যজীবদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই ০৩-জুন ০৬	১৫০০.০০	১৫০০.০০	০
৫.	অভ্যন্তরীণ পুকুর জলাশয়ে সমন্বিত কার্প ও স্বাদু পানির চিংড়ী চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প	জুলাই ০৩-জুন ০৬	২০০০.০০	২০০০.০০	০
৬.	ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প	জুলাই ০৩-জুন ০৬	২০০০.০০	২০০০.০০	০
সংস্থা ঃ মাৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট					
৭.	মৎস্য গবেষণা কর্মসূচী জোরদারকরণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প	জুলাই ০৩-জুন ০৬	১২০০.০০	১২০০.০০	০
উপমোট ঃ (মৎস্য-৭টি)			১২১৩৬.০০	১২১৩৬.০০	০

১৫।	রোন পুল্যাংক এগ্রোভেট বাংলাদেশ লিঃ ২৯, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন- ৮৬১৯৩৪৬	ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স
১৬।	এগ্রোকেয়ার লিঃ ক)১২৭/২, শাহ আলীবাগ মীরপুর-১, ঢাকা, ফোন- ৮০১৭১১৯,৮০১১১৫৪ খ) হোটেল সীভিউ লিঃ রুম নং- ২০১, কক্সবাজার। ফোন- (০৩৪১) ৪৪৯১, ৩৫১৮	আর্টিমিয়া, আর্টিমিয়া ফ্লেপ, এ,পি, স্পাইরোলিনা
১৭।	মেসার্স রশিদ পিটুইটারী ইন্ডাষ্ট্রি পুলের হাট, বেনাপোল রোড, যশোর। হেড অফিস ঃ ফোন- (০৪২১) ৩৯০৫ খ) পূর্ণমনি এন্টারপ্রাইজ মাসকান্দা, ময়মনসিংহ, ফোন- (০৯১) ৫৪১৫৮ গ) মোঃ শাহাজান মিয়া ধলা বাজার, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ ঘ) আলহাজ্ব আবদুল ওহাব ৮১/৩, শুক্রাবাদ, ঢাকা, ফোন- ৯১৩১৬৯২ ঙ) শ্রী বিশ্বনাথ সরকার শাহাপুর, শান্তাহার, নওগাঁ রোড, বগুড়া। চ) কল্পতরু মৎস্য হ্যাচারী প্রোঃ ডাঃ সুলতান আহমেদ কোম্পানীগঞ্জ, কুমিল্লা। ছ) মোঃ মফিজ মজুমদার রায়পুর, লক্ষীপুর। জ) আল-মদিনা মৎস্য হ্যাচারী, তেমুহনী, মহিপাল, ফেনী, ফোন- (০৩৩১) ৭৩৬৬৫ ঝ) নবীন মৎস্য হ্যাচারী প্রোঃ মোঃ মোস্তফা মিয়া রেল ষ্টেশন গেট, নাটোর, ফোন- (০৭৭১) ৬৬৮৩	পিজি, এইচ সিজি, ক্লোরন, ওভাপ্রিম।
১৮।	ক) আন্তরিক ইন্টারন্যাশন্যাল কর্পোরেশন রুম নং- ১২ ও ১৩ দেলওয়ার কমপ্লেক্স (১ম তলা), ২৬, হাটখোলা রোড, ঢাকা-১২০৩ খ) গোল্ড কোষ্ট শ্রিম্প হ্যাচারী হ্যাচারী জোন মেরীন ড্রাইভ রোড কলাতলী, কক্সবাজার, ফোন- (০৩৪১) ৪৭২০	চিংড়ি হ্যাচারী ও মৎস্যচাষ সংক্রান্ত যাবতীয় যন্ত্রপাতি, ঔষধ, আর্টিমিয়া, খাদ্য।
১৯।	জেনারেল ডাইনামিক্স লিঃ মডার্ন ম্যানশন (১১ তলা) ৫৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা। ফোন- ৯৫৫৭১৪০	এ্যাকোয়াকালচার ইকুইপমেন্ট এবং কেমিক্যাল,
২০।	লাকি ষ্টোরস, কে,সি,ডে, রোড, চট্রগ্রাম, ফোন-(০৩১) ২২৩১১০	চিংড়ি ও মাছের খাদ্যে ব্যবহৃত প্রিমিক্স
২১।	প্যারাগন এন্টারপ্রাইজ লিঃ ১৩/৫, আউটার সার্কোলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।	মৎস্য সম্পর্কিত বিভিন্ন দ্রব্য।
২২।	জেনেটিকা ১১৪, মতিঝিল বা/এ, রেড ক্রিসেন্ট ভবন, ঢাকা-১০০০, ফোন- ৯৫৫১৩১৩	মাইক্রো ব্যাক্টার (পানি পরিশোধক), ষ্টোরিডোল-২০ (পানি দুষন নিয়ন্ত্রক এবং মৎস্য রোগ প্রতিরোধক) মাইক্রো ব্লু (শৈবাল নামক) মাইক্রো পার্ল, মোল্ট- ৭ (চিংড়ির খোলস পাল্টানোর সহায়ক সম্পুরক খাদ্য) এম এইচ-১০ (পুকুরে মাছের খাদ্যের অভাব পুরনকারী)

মৎস্য পক্ষ ২০০৩ এ পুরস্কারের জন্য মনোনীত প্রার্থীদের নামের তালিকা

ক্রমিক নং	পুরস্কারের ক্ষেত্র	মনোনীত পুরস্কার প্রার্থীর নাম ও ঠিকানা	পুরস্কার
১	মাছের রেণু উৎপাদন	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন শাপলা মৎস্য হ্যাচারী , ধলা ত্রিশাল, ময়মনসিংহ	স্বর্ণ পদক
২	ঐ	জনাব মোঃ আব্দুল আলীম মুক্তেশ্বরী ফিস হ্যাচারী কাজিপুর, যশোর সদর, যশোর	রৌপ্য পদক
৩	ঐ	জনাব মোঃ আজাহার আলী আকন্দ লক্ষীপুর, কাহালু, বগুড়া	ব্রোঞ্জ পদক
৪	মাছের পোনা উৎপাদন	জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান(মিলন) গ্রামঃ ভবার বেড়, শার্শা, যশোর	স্বর্ণ পদক
৫	ঐ	জনাব মোঃ আনোয়ারুল করিম আনু মৎস্য নার্সারী , চাঁচড়া, যশোর	রৌপ্য পদক
৬	ঐ	জনাব চিত্তরঞ্জন বর্মণ মেসার্স ঋতুপর্ণা এন্টারপ্রাইজ মিঠাইভাঙ্গা, হোমনা, কুমিল্লা	ব্রোঞ্জ পদক
৭	মাছ উৎপাদন	জনাব মোঃ মজিবুর রহমান মল্লিক মল্লিক মৎস্য খামার, ভালুকা, ময়মনসিংহ	স্বর্ণ পদক
৮	ঐ	প্রভাতী ফিশারীজ লিঃ সংচাইল, দেবীদ্বার, কুমিল্লা	রৌপ্য পদক
৯	ঐ	জনাব মোঃ অহিদুজ্জামান ভূঞা কেমতলী, বরুড়া, কুমিল্লা	ব্রোঞ্জ পদক
১০	চিংড়ি পোনা (পি.এল উৎপাদন)	সৌদিয়া হ্যাচারী, সোনারপাড়া উখিয়া, কক্সবাজার	স্বর্ণ পদক
১১	ঐ	রেডিয়েন্ট হ্যাচারী সোনারপাড়া, উখিয়া, কক্সবাজার	রৌপ্য পদক
১২	ঐ	জনাব মোঃ আবুল কাসেম, বেলী নাসারী, আশাশুনী, সাতক্ষীরা	ব্রোঞ্জ পদক
১৩	চিংড়ি উৎপাদন	জনাব আলহাজ্ব মোঃ আব্দুস সবুর ইটাগাছা, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা	স্বর্ণ পদক
১৪	ঐ	জনাব এস.এম রফিকুল হক কালিনগর, দাকোপ, খুলনা	রৌপ্য পদক
১৫	ঐ	জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম নেহালপুর, মনিরামপুর, যশোর	ব্রোঞ্জ পদক
১৬	মৎস্যজাত পন্য রপ্তানীকরণ(হিমায়িত চিংড়ি/মৎস্য ,শুটকী)	রুপসা ফিস এন্ড এলাইড ইন্ড্রাষ্ট্রিজ লিঃ গ্রাম- পাইকপাড়া, বাগেরহাট সদর, বগেরহাট	স্বর্ণ পদক
১৭	ঐ	সালাম সী ফুডস লিঃ গ্রাম ঃ চর রুপসা, বাগমারা উপজেলাঃ রুপসা, জেলাঃ খুলনা	রৌপ্য পদক
১৮	ঐ	কোষ্টাল সী-ফুডস লিঃ বি ১১-১২ বিসিক শিল্প নগরী, সাগরিকা রোড, চট্টগ্রাম।	ব্রোঞ্জ পদক
১৯	মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে উদ্যোক্তা সৃষ্টি	জনাব মোঃ আবদুল হাই পরিচালক বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, ২৪-২৫, দিলকুশা, বাণিজ্যিকএলাকা মতিঝিল,ঢাকা।	স্বর্ণ পদক
২০	ঐ	জনাব মোঃ রুহুল আমিন খামার ব্যবস্থাপক মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার নাটোর সদর, নাটোর।	রৌপ্য পদক

মৎস্য পক্ষ ২০০৩ এর কর্মসূচী

ক. কেন্দ্রীয় পর্যায়

তারিখ ও দিন	কর্মসূচী	স্থান	বাস্তবায়নে
১০/৮/২০০৩ রোজ ঃ রবিবার সময়ঃ ১০.০০ ঘটিকা	**সাক্ষাৎকার গ্রহণ।** অংশগ্রহণে ঃ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, সচিব,মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএফআরআই, চেয়ারম্যান, বিএফডিসি	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ	জনসংযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় , মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর এবং মৎস্য অধিদপ্তর
১০/৮/২০০৩ রোজ ঃ সোমবার সময়ঃ ১২.০০ ঘটিকা	**সাংবাদিক সম্মেলন।** অংশগ্রহণেঃ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক, মৎস্যঅধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএফআরআই, চেয়ারম্যান বিএফডিসি	মৎস্য অধিদপ্তর সম্মেলন কক্ষ, ৬ষ্ঠ তলা।	জনসংযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তর
উদ্বোধনী দিনের পুর্বের দিন ১১/৮/২০০৩ রোজঃ সোমবার সময়ঃ বাংলা সংবাদের আগে	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতি মন্ত্রী ও সচিব কর্তৃক মৎস্য পক্ষ ২০০৩ এর উপর সাক্ষাৎকার ও সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠান বিটিভি ও অন্যান্য মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার	ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও সংবাদপত্রে প্রচার	বিটিভি, রেডিও ও অন্যান্য চ্যানেল
১২/৮/২০০৩ ১ম দিন,	উদ্বোধনী দিনে ৩টি বাংলা ও ১টি ইংরেজী জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ।	ইত্তেফাক, যুগান্তর, দিনকাল ও অবজারভার	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় ও মৎস্য অধিদপ্তর,
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১২/৮/২০০৩ রোজঃ মঙ্গলবার সময়ঃ	● **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মৎস্য পক্ষ' ২০০৩ উপলক্ষে স্মারক ডাক টিকিট অবমুক্তকরণ।** ● মৎস্য সেক্টরে বিশেষ অবদানের জন্য শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকারীদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুরস্কার প্রদান। ● মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ এবং মৎস্য পক্ষ'২০০৩ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা ● মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পোনা অবমুক্তি	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সড়াইল উপজেলার বিডিআর প্যারেড গ্রাউন্ড ধরন্তীঘাট উন্মুক্ত জলাশয়, সরাইল, ব্রাহ্মনবাড়িয়া	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তর ঐ
১২/৮/২০০৩	উদ্বোধনী দিনে শ্লোগান ও চিত্র সম্বলিত ব্যানার পোষ্টার ও ডিসপ্লে বোর্ড দিয়ে ঢাকার বিভিন্ন সড়ক-দ্বীপ সজ্জিত করণ। বিভাগীয় পর্যায়ে ও অনুরূপ কার্যক্রম গ্রহন। মৎস্য ভবন আকর্ষনীয়ভাবে সজ্জিতকরণ	ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে	মৎস্য অধিদপ্তর এবং বিএফডিসি।
পক্ষ ব্যাপী	ইতোপূর্বে প্রদর্শিত মৎস্য বিষয়ক আকর্ষনীয় অনুষ্ঠানের পুনঃ প্রচার অথবা পক্ষ ব্যাপী প্রতিদিন নতুন অনুষ্ঠান প্রচার। প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন।	ইলেকট্রনিক মিডিয়া সমূহ	মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর।
১৩/৮/২০০৩ রোজঃ বুধবার সময়ঃ ৮.০০ঘটিকা	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় এর নেতৃত্বে র‍্যালী অনুষ্ঠান	মৎস্য অধিদপ্তর → শিক্ষা ভবন → জিপিও→প্রেসক্লাব	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তর
১৩/৮/২০০৩ রোজঃ বুধবার সময়ঃ ১০.০০ ঘটিকা	দারিদ্র বিমোচনে মৎস্য সেক্টরের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার প্রধান অতিথিঃ- জনাব আব্দুল মান্নান ভূইয়া, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়	বিয়াম, ঢাকা	৪র্থ মৎস্য প্রকল্প